(মূল প্রতিবেদন)

পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

০৫ জানুয়ারি ২০২২

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. নেওয়াজুল মওলা, *রিসার্চ ফেলো, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-রিসার্চ অ্যাণ্ড পলিসি, টিআইবি*
এম. জাকির হোসেন খান, *সাবেক সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি*

গবেষণায় সহযোগিতা

সামিনা শাম্মী, *গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি*

কৃতজ্ঞতা

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারী এবং গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। এই গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং কারিগরি নানা বিষয়ে সাহায্য করার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটি ইউনিটের সহকর্মী মো. মাহ্ফুজুল হক এর প্রতি।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন:(+৮৮০-২)৪৮১১৩০৩২,৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা **৭**
১.১. প্রেক্ষাপট ৯
১.২. গবেষণার যৌক্তিকতা ১০
১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য ১০
১.৪. গবেষণা পদ্ধতি ১১
১.৪.১. তথ্যের উৎস....... ১১
১.৪.১.১. প্রত্যক্ষ তথ্য....... ১১
১.৪.১.২. পরোক্ষ তথ্য ১৩
১.৪.২. তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা ১৩
১.৪.৩. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ ১৩
১.৪.৪. গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময় ১৩
১.৪.৫. বিশ্লেষণ কাঠামো....... ১৩
১.৪.৬. প্রতিবেদনের কাঠামো ১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো **১৫**
২.১. পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্রমবিকাশ ও প্রেক্ষিত ১৫
২.২. পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো....... ১৫
২.২.১. সাংগঠনিক কাঠামো....... ১৫
২.২.২. পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্ষমতা ও কর্ম পরিধি ১৬
২.২.৩. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ১৬
২.২.৩.১. পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো ১৬
২.২.৪. প্রাতিষ্ঠানিক ডিজিটাইজেশান ১৭
২.৩.৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ১৭
২.৩.৫.১. বাজেট বরাদ্দ ও প্রাপ্তি ১৭
২.৩.৫.২. রাজস্ব সংগ্রহ....... ১৮
২.৩.৫.৩. ক্রয়....... ২০
২.৩.৬. অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন ব্যবস্থা....... ২০
২.৩.৬.১. অভিযোগ গ্রহণের বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা ২০
২.৩.৬.২. অভিযোগ নিস্পত্তি করার প্রক্রিয়া....... ২০
২.৩.৭. গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষা....... ২১
২.৩.৮. তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রম....... ২২
২.৩.৯. পরিবেশ অধিদপ্তরের অংশীজন....... ২২
২.৩.১০. পরিবেশ অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ ও অর্জন....... ২৩
তৃতীয় অধ্যায়: পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনি কাঠামো **২৫**

৩.১ পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনি কাঠামো..25
৩.১.১. সাংবিধানিক স্বীকৃতি ২৫
৩.১.২. পরিবেশ সংক্রান্ত আইন..২৫
৩.১.২.১. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ....২৫
৩.১.২.২. মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯..২৬
৩.১.২.৩. পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ ....২৬
৩.১.২.৪. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ ....২৭
৩.১.২.৫. বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ ....২৭
৩.১.৩. পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা ২৭
৩.১.৩.১. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ ....২৭
৩.১.৩.২. ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ ....২৭
৩.১.৩.৩. শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬..২৮
৩.১.৩.৪. চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ ....২৮
৩.১.৩.৫. বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ ....২৮
৩.১.৩.৬. বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২..২৯
৩.১.৩.৭. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ ....২৯
৩.১.৪. নীতিমালা ২৯
৩.১.৪.১. জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮..২৯
৩.১.৪.২. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), ২০২০ ....৩০
৩.১.৪.৩. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৩০
৩.২. বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা, প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও প্রভাব..৩০
৩.২.১. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ....৩০
৩.২.২. মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ ....৩১
৩.২.৩. পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০..৩১
৩.২.৪. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩..৩১
৩.২.৫. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭..৩২
৩.২.৬. শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ ....৩২
৩.২.৭. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ ....৩৩
৩.৩. পরিবেশ আইন প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জসমূহ ৩৩
৩.৩.১. আদালত সংকট ৩৩
৩.৩.২. আদালতের চেয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রাধান্য ৩৩
৩.৩.৩. আইনি জটিলতা..৩৩

৩.৩.৪. নিয়মিত তদন্ত প্রতিবেদন জমা না দেওয়া ৩৩

৩.৩.৫. আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবহেলা ৩৪

চতুর্থ অধ্যায়: পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কর্মসম্পাদনে সীমাবদ্ধতা ৩৫

৪.১. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কর্মসম্পাদনে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ ৩৫

৪.১.১. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ ৩৫

৪.১.১.১. জনবল ঘাটতি ৩৫

৪.১.১.২. বিশেষায়িত জ্ঞানের অভাব ৩৫

৪.১.২. ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিক্যাল ৩৫

৪.১.৩. আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ৩৬

৪.১.৪. আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ ৩৬

৪.১.৪.১. পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বরাদ্দ ৩৬

৪.১.৪.৩. জরিমানার অর্থ আদায় ৩৬

৪.১.৪.৪. জোনভিত্তিক ভ্যাট ট্যাক্স জমা ৩৭

৪.১.৪.৫. 'পলুটারস পে প্রিন্সিপল' বাস্তবায়ন ৩৭

৪.২. স্বচ্ছতাজনিত চ্যালেঞ্জ ৩৭

৪.৩. জবাবদিহির ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ ৩৮

৪.৩.১. কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণে ঘাটতি ৩৮

৪.৩.২. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদারকির ঘাটতি ৪০

৪.৩.৩. গতানুগতিক নিরীক্ষা প্রক্রিয়া ৪০

৪.৩.৪. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় ঘাটতি ৪০

২.৪. জনঅংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ঘাটতি ৪১

৪.৫. কার্যসম্পাদনের চ্যালেঞ্জসমূহ ৪১

৪.৫.১. ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ চিহ্নিতকরণ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা ৪১

৪.৫.২. দখলকৃত প্রাকৃতিক ও নাগরিক সম্পদ পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণ ৪২

৪.৫.৩. মেয়াদোত্তীর্ণ পরিবেশগত ছাড়পত্র ৪৩

৪.৫.৪. ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও আদায় ৪৩

৪.৫.৫. মামলা পরিচালনা ৪৪

৪.৬. পরিবেশ রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ৪৫

পঞ্চম অধ্যায়: পরিবেশ অধিদপ্তর ও পরিবেশকেন্দ্রিকদুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা ৪৬

৫.১. আইনের প্রয়োগ ৪৬

৫.২. ক্ষমতার অপব্যবহার ৪৭

৫.৩. মনিটরিং এণ্ড এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে দুর্নীতি ৪৮

৫.৪. ইআইএ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি ৪৯

৫.৫. ছাড়পত্র প্রদানে দুর্নীতি ও অনিয়ম ৫০

৫.৬.অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতি ৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সুপারিশমালা..৫২
৬.১. সার্বিক পর্যবেক্ষণ..৫২
৬.২. সুপারিশমালা..৫৩
৬.২.১. নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যা করণীয়.. ৫৩
৬.২.২. পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার সংশোধন, প্রণয়ন ও প্রতিপালন ৫৩
৬.২.৩. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা.. ৫৪
৬.২.৪. অবকাঠামো ও লজিস্টিক্যাল.. ৫৪
৬.২.৫. ডিজিটাইজেশন.. ৫৪
৬.২.৬. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ৫৪
৬.২.৭. দুর্নীতি প্রতিরোধে পদক্ষেপ ৫৫
৬.৩. তথ্যসূত্র..৫৫
৬.৪. সংযুক্তি..৫৯

সারণি, চিত্র ও সংযুক্তিরতালিকা

সারণি-১: গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ১১
সারণি-২: পরিবেশ ছাড়পত্রগ্রহীতা জরিপের বিস্তৃতি ১২
সারণি-৩: সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কাঠামো ১৩
সারণি-৪: পরিবেশ অধিদপ্তরে জনবলের সারসংক্ষেপ ১৬
সারণি-৫: বাজেট ব্যবহারের সক্ষমতা ১৮
সারণি-৬: সর্বশেষ পাঁচ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তরে খাতভিত্তিক মোট আয়ের/রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ১৯
সারণি-৭: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত ২০১৯ সালের কার্যক্রম ২২
সারণি-৮: পরিবেশ অধিদপ্তর/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিটিশনের পরিসংখ্যান ৪৪
সারণি ৯: পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির পরিমাণ ৫১
চিত্র-১: পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ১৫
চিত্র-২: পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে শিল্পকারখানা বাৎসরিক তদারকি ৩৮
চিত্র-৩: মেয়াদোত্তীর্ণ পরিবেশগত ছাড়পত্র নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা ৪২
চিত্র-৪: তথ্য সংগ্রহের সময় ছাড়পত্র নবায়নের অবস্থা ৪২
চিত্র-৫: স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র পাপ্তি ৪৫
চিত্র-৬: আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র প্রাপ্ত শিল্প কারখানা ৪৬
চিত্র-৭: ছাড়পত্র প্রাপ্তির আগে লাল ক্যাটাগরী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ইআইএ রিপোর্ট জমা দেওয়ার হার ৪৯
চিত্র-৮: পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়ম ৫০

চিত্র-৯: পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ছাড়াই কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভূক্ত শিল্প কারখানা/প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান ৫০

চিত্র-১০: পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন ৫১

সংযুক্তি-১: শ্রেণিভিত্তিক শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ৫৯

সংযুক্তি-২: বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি, প্রটোকল ইত্যাদিতে অনুস্বাক্ষর/অনুসমর্থন/অভিগমনের তালিকা ৫৯

সংযুক্তি-৩: পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য যা যা প্রয়োজন ৬২

সংযুক্তি-৪: পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন ফি ৬২

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ও পরিভাষা

আইইই	ইনিশিয়াল এনভাইরনমেন্ট এক্সামিনেশন/ প্রাথমিক পরিবেশগত প্রভাব পরীক্ষা
আইকিউএয়ার	আইকিউএয়ার-ওর্য়াল্ড এয়ার কোয়ালিটি রিপোর্ট
আইএমইডি	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ইপিআই	এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইনডেক্স
ইআইএ	এনভাইরনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট/পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
ইসিসি	এনভাইরনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট/পরিবেশ ছাড়পত্র
ইসিএ	ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া
ইএমপি	এনভাইরনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান/পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
এইচইআই	হেলথ ইফেক্ট ইন্সটিটিউট
এসডিজি	সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
এসআইএ	সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট
এলজিইডি	স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ
ডিও	ডিসলভড অক্সিজেন
বিওডি	বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড
বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
বিসিসিটিএফ	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফাণ্ড
সিওডি	কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড
সিএজি	মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
সিডিকেএন	ক্লাইমেট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট নলেজ নেটওয়ার্ক
টিএসএস	টোটাল সাসপেন্ডেড সলিডস
জিডিপি	মোট দেশজ উৎপাদন
জেএনএ	জয়েন্ট নীডস অ্যাসেসমেন্ট
পাউবো	পানি উন্নয়ন বোর্ড
ভিজিএফ	ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। টিআইবি'র অগ্রাধিকার খাতগুলোর মধ্যে পরিবেশ অন্যতম।

পরিবেশ উন্নয়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, পরিবেশ সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নসহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের মুখ্য প্রতিষ্ঠান পরিবেশ অধিদপ্তর। পরিবেশ আইন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারের ফোকাল প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কতটুকু কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ রক্ষা এবং দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগসহ অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ও কার্যকরতার দিকসমূহ সুশাসনের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণায় একদিকে যেমন পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে এবং অন্যদিকে বিদ্যমান আইন, বিধিমালাসহ সম্পূরক আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগে পরিবেশ অধিদপ্তরের ব্যর্থতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকে, যেমন স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, জনসম্পৃক্ততা এবং কার্যকর সমন্বয়ে ঘাটতি বিদ্যমান। অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বড় অংকের নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতির ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ সরকারি বিভিন্ন বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্প কারখানা স্থাপনই মূলত পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ অগ্রাধিকার কার্যক্রমের অংশ হওয়ার কথা থাকলেও এক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিদ্যমান ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থতা লক্ষণীয়। সরকারি বিভিন্ন বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্প কারখানা স্থাপন, সংকটাপন্ন এলাকা, বন ও এর আশেপাশে বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশ সমীক্ষা সম্পাদন এবং এসবের অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর বিদ্যমান আইনি ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছে। এছাড়া একদিকে সক্ষমতার ঘাটতি এবং অন্যদিকে সরকারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণে অনেকক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণে দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষা করতে পারছে না পরিবেশ অধিদপ্তর। আমলা-নির্ভরতা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ঘাটতি, নীরিক্ষায় ঘাটতি, পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি এবং অনেক ক্ষেত্রে সৎ সাহস ও দৃঢ়তার ঘাটতির কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর একটি দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অনেকাংশে অক্ষম ও অকার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হয়েছে।

গবেষণায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, তথ্যদাতাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা প্রয়োজনীয় নথি, তথ্য, অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রদান করে এ গবেষণায় সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

টিআইবি'র উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, প্রফেসর ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ গবেষণার পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ক রিসার্চ ফেলো মো. নেওয়াজুল মওলা। টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, শাহজাদা এম আকরাম এবং জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিভাগের সাবেক সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার এম. জাকির হোসেন খান গবেষণাটি তত্ত্বাবধান করেছেন। এই গবেষণার কারিগরি নানা বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটি প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. মাহ্ফুজুল হক। এছাড়াও টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি এবং সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সহকর্মীগণ গবেষণায় বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও সহায়তা করেছেন।

এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ পরিবেশ রক্ষা এবং দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধিসহ সার্বিকভাবে সুশাসন ও শুদ্ধাচার বৃদ্ধির সহায়ক হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। প্রতিবেদনটির পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের যেকোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১. প্রেক্ষাপট

পরিবেশ বলতে কোনো ব্যবস্থার ওপর কার্যকর বাহ্যিক প্রভাবকসমূহের সমষ্টিকে বোঝায়। পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের দ্বারাই একজন ব্যক্তি, প্রাণী বা জীব এমনকি উদ্ভিদ প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই প্রভাবকসমূহের মধ্যে থাকে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহ। পরিবেশের প্রতিটা উপাদানের সুসমন্বিত রূপই হলো সুস্থ পরিবেশ। এই সুসমন্বিত রূপের ব্যত্যয় পরিবেশের দূষণ ঘটায়। মানবজাতিকে সুস্থভাবে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থার মতে, বিশ্বে প্রতিবছর মানুষের মোট মৃত্যুর মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ (১২.৬ মিলিয়ন) মানুষের মৃত্যু হয় পরিবেশগত বিপর্যয়জনিত কারণে।[১] বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব।[২] এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন, প্রটোকল[৩] ইত্যাদিতে অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।[৪] একইসাথে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবেশ দূষণ রোধ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও সুশাসন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।[৫]

এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইনডেক্স (ইপিআই)-২০২০ অনুযায়ী, ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২তম, যাতে পরিবেশ দূষণ রোধে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থান ১৬তম।[৬] আইকিউএয়ার-ওর্য়াল্ড এয়ার কোয়ালিটি রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী, বায়ু দূষণের বিভিন্ন উপাদানের বাৎসরিক গড় উপস্থিতির হিসেবে দূষণের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে এবং দূষিত রাজধানীর তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢাকা।[৭] যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক হেলথ ইফেক্ট ইন্সটিটিউট (এইচইআই) পরিচালিত 'দ্যা স্টেট অফ গ্লোবাল এয়ার ২০২০' গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী বায়ু দূষনজনিত কারণে গত এক দশকে বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩১,৩০০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুর হার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৮] বিশ্ব ব্যাংকের 'বাংলাদেশ পরিবেশ সমীক্ষা-২০১৭' অনুযায়ীবাংলাদেশে পরিবেশ দূষণজনিত কারণে প্রতি বছর জিডিপির ২.৭ শতাংশ হারায়; পোষাক উৎপাদনকারী কারখানাগুলো হতে প্রতি এক টন কাপড় উৎপাদনের বিপরীতে ২০০ টন বর্জ্য পানি নির্গত হয়, এবং বিবিধ প্রকার দূষণের কারণে ২০১৭ সালের বর্ষা মৌসুমে রাজধানীতে টিকে থাকা ১৩টি খালের মধ্যে সচল ছিল মাত্র দুটি। অন্যদিকে,'বাংলাদেশ পরিবেশ সমীক্ষা-২০১৮' অনুযায়ী বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের কারণে মৃত্যুর হার ২৭.৭%; বায়ু দূষণের ফলে প্রতি বছর আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৫৪ হাজার কোটি টাকা;

---

[১] ইউনাইটেড নেশনস এনভাইরনমেন্ট প্রোগ্রাম, *Healthy Environment, Healthy People(2012)*, বিস্তারিত দেখুন- https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/premature-deaths-environmental-degradation-threat-global-public সর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১। https://www.who.int/phe/news/e-News-82.pdf

[২]অনুচ্ছেদ ১৮ (ক), পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-957.html সর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

[৩]সংযুক্তি-১ দেখুন।

[৪]জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৮), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৫] অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তাড়িত দেখুন: http://plancomm.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/68e32f08_13b8_4192_ab9b_abd5a0a62a33/2021-02-03-17-04-ec95e78e452a813808a483b3b22e14a1.pdf

[৬]এনভাইরনমেন্ট পারফরমেন্স ইনডেক্স, *Global metrics for the environment: Ranking country performance on sustainability issues (2020),* বিস্তারিত দেখুন-https://epi.yale.edu/downloads/epi2020report20210112.pdfসর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

[৭]আইকিউ এযার; *World Air Quality Report Region & City PM2.5 Ranking(2020),* বিস্তারিত দেখুন- https://www.iqair.com/world-most-polluted-countriesসর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

[৮]হেলথ ইফেক্ট ইন্সটিটিউট, *State of global air: a special report on global exposure to air pollution and its health impacts(2020)*, বিস্তারিত দেখুন-https://fundacionio.com/wp-content/uploads/2020/10/soga-2020-report.pdfসর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

মূলত পাঁচটি উৎস থেকে বায়ু দূষণ হয়, যেমন ইট ভাটা (৫৮%), যানবাহনের ধোঁয়া (১০%), মাটি ও সড়কের ধূলা (৮%) এবং কাঠসহ নানা ধরনের বস্তু পোড়ানো (৭%)।[৯]

বর্তমানেপরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ মানুষের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। আর্ন্তজাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ-এর ২০২০ সালে প্রকাশিত 'গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স' (সিআরআই) অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিরবিচারে শীর্ষ ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (অভীষ্ট ৬, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫) অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের মুখ্যপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব। পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবেও বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব রয়েছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আইন থাকলেও পানি, বায়ু ও শব্দ দূষণসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতাসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো বাধ্যবাধকতা থাকলেও বর্জ্য শোধনাগার ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা, ছাড়পত্র প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও আর্থিক যোগসাজশ,[১০] বিভিন্ন পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (রামপাল, রূপপুর) প্রতিবেদন তৈরির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা বিতর্ক ইত্যাদি।[১১,১২,১৩]

১.২. গবেষণার যৌক্তিকতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর অগ্রাধিকার খাতগুলোর মধ্যে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন খাত অন্যতম। টিআইবি বিভিন্ন সময়ে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় (২০১৫) পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) ও ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ইসিএ) ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতি প্রতিফলিত হয়েছে, যা পরিবেশ অধিদপ্তরের এখতিয়ারভুক্ত। তবে এসব গবেষণায় পরিবেশ অধিপ্তরের সুশাসন সংক্রান্ত গভীর বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি, ফলে এক্ষেত্রে আরও গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণ ও সুবিধাভোগী নির্বাচন ও জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে শুদ্ধাচার চর্চায় ঘাটতি লক্ষণীয়। পরিবেশ রক্ষা এবং দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগসহ অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ও কার্যকরতার দিকসমূহ সুশাসনের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এই গবেষণার পর্যবেক্ষণ আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর ও সুশাসিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

---

[৯] Enhancing Opportunities for Clean and Resilient Growth in Urban Bangladesh: Country Environmental Analysis 2018, World bank.বিস্তারিত দেখুনঃ https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/585301536851966118/enhancing-opportunities-for-clean-and-resilient-growth-in-urban-bangladesh-country-environmental-analysis-2018

[১০] হবিগঞ্জের সুতাং নদী রক্ষায় হাইকোর্টের রুল, রাইসিং বিডি, সর্বশেষ ভিজিটঃ ০৮.১২.২১, বিস্তারিত দেখুনঃhttps://www.risingbd.com/bangladesh/news/425649

[১১] পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করতে হবে, গোলাম রব্বানীঃ পরিবেশ ও সমাজবিষয়ক গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব ইয়র্ক (যুক্তরাজ্য), প্রথম আলো, সর্বশেষ ভিজিটঃ ০৮.১২.২১।

[১২] পরিবেশ রক্ষা করেই উন্নয়ন রামপাল, রূপপুর নিয়ে আলোচনায় বক্তারা, প্রথম আলো, সর্বশেষ ভিজিটঃ ০৮.১২.২১।

[১৩] রামপালসহ 'প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশী' প্রকল্প বাতিলের দাবি, সারাবাংলা,সর্বশেষ ভিজিটঃ ০৮.১২.২১, বিস্তারিত দেখুনঃhttps://sarabangla.net/post/sb-570881/

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

১. পরিবেশ অধিদপ্তরের আইন প্রতিপালনে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা
২. পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা
৩. পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
৪. পরিবেশ অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.৪. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণগত এবং পরিমাণগত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৪.১. তথ্যের উৎস

এই গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বিত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উৎস অনুযায়ী তথ্যের ধরন ও তথ্যের উৎসসহ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি-১: গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্যের ধরন		তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	গুণগত	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৩০টি)	পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরিবেশ ছাড়পত্রগ্রহীতা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতা, ইআইএ পরামর্শক এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
		পর্যবেক্ষণ (৭টি)	পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং প্রধান ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্নকার্যালয়
	পরিমাণগত	জরিপ (৩৫৩টি)	পরিবেশ ছাড়পত্রগ্রহীতা
পরোক্ষ তথ্য		বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট

১.৪.১.১. প্রত্যক্ষ তথ্য

গবেষণাটিতে বিদ্যমান তথ্যের মূল উৎস হচ্ছে মাঠ হতে সংগৃহীত তথ্য। গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কিংবা এসব বিষয়ে অবহিত অধিদপ্তরের বর্তমান ও সাবেক কর্মীদের নিকট হতে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৪.১.১.১. গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ওপরগুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গুণগত তথ্যের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনি কাঠামো ও সীমাবদ্ধতা,

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ, পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদানে সক্ষমতা ও কার্যকরতা, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা ও কার্যকরতা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা কার্যক্রম ও পরিবেশ সুরক্ষায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে এবং প্রয়োজনীয় মতামত নেওয়ার জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পরিবেশ ছাড়পত্রগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতা, ঠিকাদার, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ,নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, পরামর্শক সংস্থা,সাংবাদিকএবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপক/তত্ত্বাবধায়কের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৪.১.১.২. পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

জরিপের নমুনায়ন

পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান। ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন ধাপে সম্পন্ন হয় এবং প্রতিটি ধাপেই দুর্নীতি ও অনিয়মের সুযোগ রয়েছে। তাই এই গবেষণায় শিল্প কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অসঙ্গতিগুলো তুলে আনার জন্য ২০১৭ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো এবং চট্টগ্রাম মেট্রো থেকে ছাড়পত্র গ্রহণকারী কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমূহকে নির্বাচন করা হয়। এই দুই এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭ সালে মোট ৫১২টি প্রতিষ্ঠানকে ছাড়পত্র ইস্যু করা হয়। টিআইবির গবেষণার জন্য সেখান থেকে মোট ২৮৮টি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়। ঢাকা মেট্রো এলাকার বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ২৯৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নমুনায়নের মাধ্যমে ১৭০টিকে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। একইসাথে চট্টগ্রাম মেট্রো এলাকার বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ২১৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নমুনায়নের মাধ্যমে ১১৮টি প্রতিষ্ঠানকে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। সবুজ ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী সবুজ ক্যাটাগরির দুই এলাকাতে মোট ২টির মধ্যে ২টিই জরিপের আওতায় নেওয়া হয়। কমলা-ক ক্যাটাগরি ক্ষেত্রে দুই এলাকাতে ১২২টির (ঢাকাতে ৮১টি; চট্টগ্রামে ৪১টি) মধ্যে ৮২টি (ঢাকাতে ৫৪টি; চট্টগ্রামে ২৮টি) প্রতিষ্ঠানকে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়। কমলা-খ ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠান দুই এলাকাতে ২৮৯টির (ঢাকাতে ১৫৪টি; চট্টগ্রামে ১৩৫টি) মধ্যে ১৩৩টি (ঢাকাতে ৭১টি; চট্টগ্রামে ৬২টি) প্রতিষ্ঠানকে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়। লাল ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠান দুই এলাকাতে ৯৯টির (ঢাকাতে ৬১টি; চট্টগ্রামে ৩৮টি) মধ্যে ৭১টিকে (ঢাকাতে ৪৪টি; চট্টগ্রামে ২৭টি) জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়।।

জরিপকালে উত্তর প্রদানে অস্বীকৃতি ও অনুপস্থিতির কারণে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথমে সাভার ও আমিনবাজার এলাকার মাঝামাঝি যে ইটভাটাগুলো আছে সেখানে গিয়ে স্থানীয় জনগণের সাহায্য নিয়ে একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এরপর সেই তালিকা ধরে সবগুলো ইটভাটাতেই সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য যাওয়া হয়েছে। যেসব ইটভাটা সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত ছিল তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং যেসব ইটভাটার সম্মতি ছিল না তার পরের ক্রমিকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। একইভাবে আশুলিয়া ও সাভার এলাকার মাঝামাঝি যেসব গার্মেন্টস, ডায়িং-প্রিন্টিং, টেক্সটাইল-ফেব্রিক্স, স্পিনিং ফ্যাক্টরি আছে সেখানে গিয়ে স্থানীয় জনগণের সাহায্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এরপর সেই তালিকা ধরে সবগুলো গার্মেন্টস, ডায়িং-প্রিন্টিং, টেক্সটাইল-ফেব্রিক্স, স্পিনিং ফ্যাক্টরিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য যাওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকার প্রদানে যাদের সম্মতি ছিল তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং যাদের সম্মতি ছিলনা তার পরের ক্রমিকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

সারণি-২: পরিবেশ ছাড়পত্রগ্রহীতা জরিপের বিস্তৃতি

শিল্প শ্রেণি	ঢাকা মহানগর	চট্টগ্রাম মহানগর	মোট জরিপকৃত শিল্প ইউনিট	শতকরা হার
সবুজ	১	১	২	০.৫৭
কমলা-ক	৫২	১০	৬২	১৭.৫৬
কমলা-খ	১০২	৬১	১৬৩	৪৬.১৮

লাল	৯৫	৩১	১২৬	৩৫.৬৯
সর্বমোট	২৫০	১০৩	৩৫৩	১০০

১.৪.১.২. *পরোক্ষ তথ্য*

গবেষণার পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে পরিবেশ, জলবায়ু এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, নির্দেশিকা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ, প্রতিবেদন, নথি, গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইট, ইত্যাদি। পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আধেয় বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৪.২. তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা

তথ্য সংগ্রহের জন্য KoBoToolBox App-এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্লাটফর্মে স্মার্ট ফোনের সাহায্যে প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়। ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করার কারণে একদিকে যেমন উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে মানসম্পন্ন উপাত্ত নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও জরিপের বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে জরিপ বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি গবেষণার ধারণাপত্র প্রস্তুত হতে ফলাফল উপস্থাপনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত চারটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যথা তথ্যের নির্ভরশীলতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততা নশ্চিত করা হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে তথ্য যাচাইসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই করা হয়েছে। অপরদিকে পরিমাণগত তথ্য অর্থাৎ জরিপ পরিচালনার সময় তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও গুণগত মান বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ সার্বক্ষণিক মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করে তথ্যসংগ্রহকারীদের কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও পূরণকৃত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তন্মধ্যে ১১.২% স্পট চেক, ১০.৩% অ্যাকোম্পানি চেক এবং ৭.২% ব্যাক চেক করা হয়। উল্লেখ্য প্রশ্নমালা চেক শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৪.৩. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

এ গবেষণায় সেবাগ্রহীতা জরিপের তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মূল কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা দূর করা। এক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের সাথে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টেলিফোন চেক করা হয়েছে। এরপর Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) সফটওয়্যার ব্যবহার করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নমুনায়নের প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে গ্রাহক সংযোগের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে চূড়ান্ত প্রাক্কলন নিরূপণ করার জন্য fi6 (Weight) ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলত বিভিন্ন সূচক ও চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে।

১.৪.৪. গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়

এপ্রিল ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে।

১.৪.৫. বিশ্লেষণ কাঠামো

আটটি সূচকের আলোকে এ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। (সারণি ৩ দেখুন)

সারণি-৩: সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র
আইনের শাসন	পরিবেশ রক্ষায় বিদ্যমান আইন, নীতি ও বিধি প্রতিপালনে ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ
সক্ষমতা	জনবল ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভৌত অবকাঠামো, লজিস্টিক্যাল ও প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা

স্বচ্ছতা	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থা, চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদান, ওয়েবসাইট ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবস্থাপনা
জবাবদিহিতা	কার্যক্রম তদারকি, নিরীক্ষাওঅভিযোগ ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ	অধিদপ্তরের কার্যক্রমে নাগরিক অংশগ্রহণ, গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি
কার্যসম্পাদন	ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ চিহ্নিতকরণ ও পুনরুদ্ধারে ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও আদায়, পরিবেশ মামলা পরিচালনা
সমন্বয়	পরিবেশ রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়
অনিয়ম-দুর্নীতি	দুর্নীতির ক্ষেত্র, ধরন, মাত্রা ও সংঘটক

১.৪.৬.প্রতিবেদনের কাঠামো

এই প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনি কাঠামো ও আইন প্রতিপালনে ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পরিবেশ কেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়ম সম্পর্কিত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণার উপসংহার ও সুপারিশ সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.১. পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্রমবিকাশ ও প্রেক্ষিত

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই পরিবেশ এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। ১৯৭২ সালে স্টকহোম কনফারেন্সের পরে বাংলাদেশে প্রথম পরিবেশগত কার্যক্রম গ্রহণ করে। পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৩ সালে Water Pollution Control Ordinance 1973 জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয়। সরকার ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। ২০০১ সাল পর্যন্তও পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বিভাগীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিলো। পরবর্তীকালে সরকার ২০০৯ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠোমো ২১টি জেলায় সম্প্রসারণ করে ।

২.২. পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.২.১. সাংগঠনিক কাঠামো

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে সদর দপ্তরে একজন মহাপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। এর পরে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক। সদর দপ্তরের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ পরিচালনার জন্য পরিচালক ও উপপরিচালক রয়েছেন। এছাড়া অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিস এবং গবেষণাগারের দায়িত্ব পালনের জন্য পরিচালক রয়েছেন।

চিত্র-১: পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

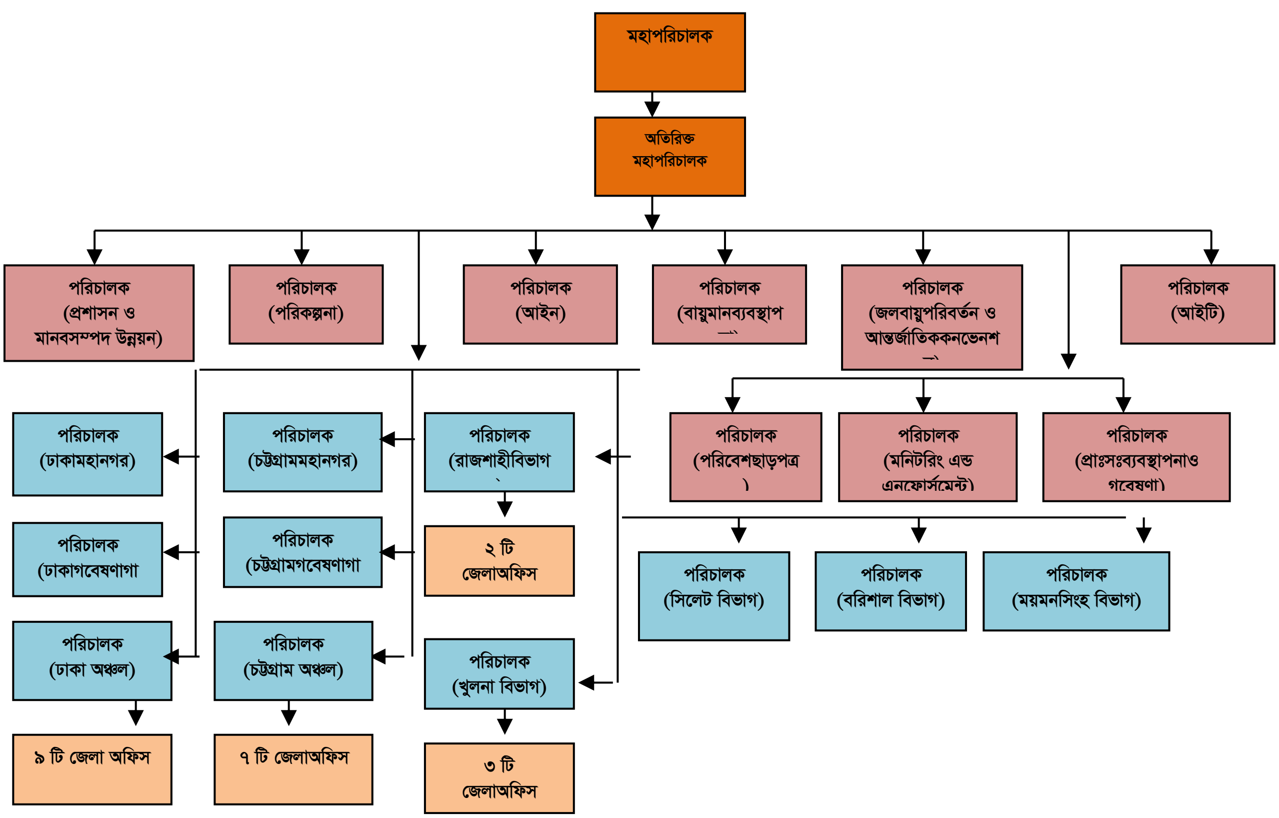

২.২.২. পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্ষমতা ও কর্ম পরিধি

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। পরিবেশ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দূষণমুক্ত বসবাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা। পরিবেশ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো হলো শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষণ জরিপ, দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা; পরিবেশ সংক্রান্ত আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ; পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্য করে তা আদায় করা; পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান; পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান; পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা; বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ; দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ।

এছাড়াও অন্যান্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রটোকলের দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ; পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন; সময় সময়ে পরিবেশগত অবস্থান চিত্র প্রণয়ন (State of Environment Report) ও বিতরণ; পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা; পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণাকর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নপূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান ইত্যাদি অন্যতম।

২.২.৩. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

২.২.৩.১. পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদিত ১১৪১টি পদের বিপরীতে ৬৭৬টি পদ শূন্য রয়েছে। অধিদপ্তরে জনবলের শূন্যপদের হার ৫৯.২৫।

সারণি-৪: পরিবেশ অধিদপ্তরে জনবলের সারসংক্ষেপ (২০২০-২১)

পদ	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পূরণকৃত পদ সংখ্যা
১ম শ্রেণী	২৭৪	১৮০
২য় শ্রেণী	২০১	৩৫
৩য় শ্রেণী	৪২৮	২১৮
৪র্থ শ্রেণী	২৩৮	৩২
মোট	১১৪১	৪৬৫

তথ্যসূত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর।

পরিবেশ অধিদপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গকোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নেই। তবে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তারা প্রশিক্ষণ সেল গঠন করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণ সেলের মধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর তার জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে।

২.২.৪. প্রাতিষ্ঠানিক ডিজিটাইজেশান

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করার ক্ষেত্রে গৃহীত প্রধান প্রধান পদক্ষেপগুলো হচ্ছেই-ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অটোমেশন করা; ইজিপি (ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) পদ্ধতির ব্যবহার করা; অভিযোগ দায়ের ও প্রতিকারের জন্য গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (জিআরএস) নামক অ্যাপস তৈরি ও প্রচলন; সমগ্র অধিদপ্তরের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি;ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থা চালু করা; হাইস্পিড ইন্টারনেট সুবিধা লাভের জন্য ব্যান্ডউইথ উন্নত করা; বিভাগীয় কার্যালয়ে অপটিক্যাল সংযোগসহ পরিপূর্ণ ল্যান সেটআপ করা; Large Volume Data শেয়ার ও সংরক্ষণ করার জন্য অধিদপ্তরের সার্ভারে নতুন সার্ভার (Network Attached Storage) সংযুক্ত করা; অভ্যর্থনা কক্ষে ইন্টারনেট সংযোগসহ একটি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার ও একটি স্ক্যানার স্থাপনের মাধ্যমে স্ব-সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা; অভ্যর্থনা কক্ষে একটি কিয়স্ক স্থাপন করা; এনফোর্সমেন্ট, রিট মামলা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি করা।[১৪] এছাড়াও সদর দপ্তরসহ প্রতিটি কার্যালয়ে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ফটোকপিয়ার, মডেম/ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি আছে।

২.৩.৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা

২.৩.৫.১. বাজেট বরাদ্দ ও প্রাপ্তি

পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য গত পাঁচ অর্থবছরে গড় বরাদ্দ ছিলো ৯৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা; পক্ষান্তরে গড় ব্যয় ছিলো ৮৫ কোটি টাকা।

চাহিদাপত্র যাচাই ও বাজেট প্রস্তাবনা

বাজেট প্রস্তাবনা তৈরির ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে সদর দপ্তর পর্যন্ত সকল কার্যালয় থেকে চাহিদাপত্র নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মতামত নেওয়া হয়। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত চাহিদাপত্র অর্থ বিভাগ যাচাই-বাছাই করে সেই অনুযায়ী বাজেট প্রস্তাবনা করে থাকে। অধিদপ্তরের ছয়টি বাজেট লাইন আছে। সেগুলো হলোঃ হেড অফিস, মহানগর, অঞ্চল, গবেষণাগার, ডিভিশন এবং জেলা। মন্ত্রণালয়ে সাধারণত বাজেটের চাহিদাপত্রের যাচাই করা হয় না। মোট বাজেট মন্ত্রণালয়ের হলেও যার যার বাজেট তার তার।[১৫] বাজেট জমা দেওয়ার পূর্বে চাহিদা যাচাই করার পর অধিদপ্তরে মিটিং করে বাজেটের প্রস্তাবনা তৈরি করতে হয়। এখন মন্ত্রণালয় যদি কোনো কিছু যাচাই করতে চায় তবে তাদের বিদ্যমান চাহিদা ও ব্যয়ের যৌক্তিকতা মন্ত্রণালয়ের মিটিংয়ে ব্যাখ্যা করতে হয়।

প্রকল্প প্রস্তাবনা

প্রকল্পের জন্য যে বরাদ্দ আসে সেটা প্রকল্পের চাহিদা চালানের মাধ্যমে হয়, যেটা মূলত প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা নিজেরা করে থাকে। প্রকল্পের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা প্রকল্পের থিম নির্বাচন করে এবং কী কারণে এই প্রকল্পে বরাদ্দ দিতে হবে তা উল্লেখ করে আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের প্রস্তাবনা দেয়। প্রকল্পের অনুমোদন হয়ে যাওয়ার পরে তারা হিসাব রাখেন কিন্তু সম্পূর্ণ হিসাব অর্থ বিভাগে জমা দিতে হয়।[১৬]

---

[১৪] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭.০২.২০২০।
[১৫] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১২.০২.২০২০।
[১৬] *প্রাগুক্ত।*

বাজেট বরাদ্দ

অর্থবছরের শুরুতেই অধিদপ্তর বাজেট বরাদ্দ হয়। পূর্বে বাজেট পেতে দেরি হলেও এখন অনলাইনে দ্রুতবরাদ্দের টাকা পাওয়া যায়।[১৭] বাজেটে ঘাটতি দেখা দিলে সেগুলো সমাধান করে নেওয়া হয় বলে তথ্য দাতারা জানান। যেমন ২০১৯ সালে চাহিদা বাজেট ছিল ৫৭ কোটি টাকা কিন্তু বরাদ্দ করা হয় ৫২ কোটি টাকা। বরাদ্দ কম হলে ঘাটতি পূরণের জন্য যন্ত্রপাতি বা যানবাহন ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত অর্থ বাজেট থেকে বাদ দেওয়া হয়।[১৮]

সারণি-৫: বাজেট ব্যবহারের সক্ষমতা (টাকা)

অর্থ বছর	বরাদ্দ		ব্যয়		রাজস্ব প্রাপ্তি
	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	রাজস্ব আদায়
২০১৬-১৭	৩৮.১৭৩১	৪১.৪২	৩২.৮৮৭০৭৮	৪১.১৩৮৭	৫৩.২৬৯৪৪৫
২০১৭-১৮	৩৬.৬২	৮৭.৯৪	৩৩.২৭৮৬	৮০.৭৯২৩	৫৭.৫৫৮৯৭৫৩
২০১৮-১৯	৪২	১০৪.৯২	৩৫.২২১৩৩৫	৯৮.৮২৬	৭০.০৫৯২৪৭
২০১৯-২০	১২.৩৩	৫০.০০	৬.৭২৩১	৩৬.০৬৮০	৬৭.৬৭৩২
২০২০-২১	২৬.১৪	৫২.৩৩৩	১৯.১১৯০	৪১.২৫৬৯	৭৬.৯৪০১

তথ্যসূত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর।

২.৩.৫.২. রাজস্ব সংগ্রহ

পরিবেশ অধিদপ্তর শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নকরণ এবং গবেষণাগারে বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ বাবদ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক নির্ধারিত ফি আদায় এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎসগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

২.৩.৫.২.১. জরিমানা/দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ

জরিমানা দণ্ডতে প্রাপ্ত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ক্ষয়-ক্ষতি পর্যালোচনা করে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা আসে সেটাই আদায় করে থাকেন। দূষণকারীরা দেশের পরিবেশের যে ক্ষতি করছে সেই ক্ষতি মিটিয়ে পরিবেশকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এই জরিমানা আদায় করা হয়।

২.৩.৫.২.২. ছাড়পত্র/নবায়ন ফি

বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নিতে হবে। এর জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফি জমা দিয়েপরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শনের পর পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া যায়।

২.৩.৫.২.৩. পরীক্ষা ও পরীক্ষণ/টেস্টিং ফি

নিয়োগ পরীক্ষাগুলোতে আবেদনকারী কর্তৃক জমাকৃত ফি এই খাতে আয়ের উৎস। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অধিদপ্তর পিএসসির মাধ্যমে ৪২ লক্ষ টাকা আয় করেছে। পিএসসিতে জমাকৃত টাকার ১২.৫% কেটে রেখে বাকি টাকা তাদের তহবিলে দিয়ে দিয়েছে এবং সেই

[১৭] *প্রাগুক্ত।*

[১৮] *প্রাগুক্ত।*

টাকা আবার অধিদপ্তরের তহবিল থেকে সরকারি তহবিলে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে।[১৯] বিবিধ ল্যাব টেস্টের জন্যও অধিদপ্তরকে নির্ধারিত পরিমাণ ফি প্রদান করতে হয়।

২.৩.৫.২.৪.অন্যান্য আদায়

সরকারি যানবাহনের লিফটিং/ ভাড়া দেওয়া, দরপত্র ও অন্যান্য দলিল পত্র বিক্রয় হতে আয়,ব্যবহৃত কাগজ, স্টেশনারী ও স্ক্র্যাপ বিক্রয়লব্ধ আয়,অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়,[২০] বিভিন্ন অবাণিজ্যিক বিক্রয় ও জব্দ মালামাল নিলামে বিক্রির মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ রাজস্ব খাতের অন্যান্য আদায়ের মধ্যে দেখানো হয়।

সারণি-৬: সর্বশেষ পাঁচ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তরে খাতভিত্তিক মোট আয়ের/রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ (লাখ টাকায়)

আয়ের খাত	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
জরিমানা, দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	১২.৭০৮৪	১৮.১০২৫	২১.৩৭০৭	১৮.৫৯৫৮
পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন ফি	৩৮.৪৮৭২	৪৪.৯৬২	৩৮.৮২০৮	৪৬.৭২৮৩
পরীক্ষা ও পরীক্ষণ/টেস্টিং ফি	৬.২৭৩৫	৬.৮৫০৪৬৮	৬.২৫২০	৭.১৩৫২
সরকারি যানবাহন ব্যবহার বাবদ আয়	০.০০৪৫	০.০০৯	০.০০০৯	০.০০১০
দরপত্র ও অন্যান্য দলিল পত্র বিক্রয় হতে আয়	০.০০৩৪	০.১৩৫	০.০০৪২	০.০৩০১
ব্যবহৃত কাগজ, স্টেশনারী ও স্ক্র্যাপ বিক্রয়লব্ধ আয়	০.০০৪৮	০.০৭২১৫	০	০
অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়	০.০৭৩৩	০.০৬১৫	০.০০১৮	০.০০৮৮
বিবিধ অবাণিজ্যিক বিক্রয় ও অন্যান্য আদায়	০.০৭৪৪	০.০০০১১২	১.২২২৮	৪.৪৪০৯
মোট আয়(কোটি টাকায়)	৫৭.৬২৯৫	৭০.০৫৯২৫	৬৭.৬৭৩২	৭৬.৯৪০১

তথ্যসূত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর।

জরিমানার যে অর্থ ট্রেজারী চালানে জমা হয় সেগুলো অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। জরিমানা থেকে উত্তোলন করা টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা দিয়ে চালান নেওয়া হয় এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে উত্তোলিত নগদ টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে উত্তোলিত টাকা আইনগতভাবে আয় বলে গৃহীত হয়না কারণ এটি ক্ষতিপূরণের জন্য আইনের মাধ্যমে ধার্য করা হয়েছে। তবে এই অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের বাজেটের সাথে সম্পর্কিত।[২১]

[১৯]তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১২.০২.২০২০।
[২০]*প্রাগুক্ত*।
[২১]*প্রাগুক্ত*

২.৩.৫.৩. ক্রয়

'ডেলিগেশন অফ ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার'-এর দেওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী যাবতীয় ক্রয় কার্য পরিচালনা করা হয়।[২২] অর্থবছরের শুরুতে অধিদপ্তর তাদের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়।

২.৩.৬. অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন ব্যবস্থা

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পরিবেশ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে দুই ধরনের অভিযোগ জমা হয়। প্রথমত,কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণ। দ্বিতীয়ত, পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। উভয় প্রকার অভিযোগ নিস্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাপরিচালককে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগকরে অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থাপনা গঠন করা হয়েছে। সাধারণ জনগণ দুই ভাবে অভিযোগ করে থাকে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিলকরতে পারে অথবা মাসিক গণশুনানিতে উপস্থিত থেকে মৌখিকভাবেও অভিযোগ পেশ করতে পারে।

২.৩.৬.১. অভিযোগ গ্রহণের বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ সরকার কেন্দ্রিয়ভাবে যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) নামক অ্যাপস তৈরী করেছে, যার মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের যেকোনো বিষয় সম্পর্কেও অনলাইনে সরাসরি অভিযোগ প্রদান করা যায়। এছাড়া পত্রিকাতে ছাপা প্রতিবেদনের কাটিং থেকেও অভিযোগ গ্রহণ করা হয় বলে তথ্য দাতারা জানান। প্রতিটি দপ্তরেই সরাসরি লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করা হয় এবং স্পর্শকাতর বিষয়ের ক্ষেত্রে মোবাইলে বা এসএমএসের মাধ্যমে গোপন তথ্য প্রদান করা হয়।[২৩]

বক্স-১: ২০২০ সালেরাত এগারোটায় একটি এলাকা থেকে ফোন এসেছে যে সেখানে সংঘবদ্ধ লোক পাহাড় কাটছে। আমাকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করে অভিযোগকারী জানান যে তিনি বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবে না। এখন এই লোকটা সত্য বলতে পারে মিথ্যাও বলতে পারে। আমি সকালে উঠে ফোন দিয়ে জানলাম ব্যাপক হারে পাহাড় কাটা হচ্ছে। এই ধরনের কেসের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের দেশে এই এমন মানুষ খুব কমই আছে যিনি আমাকে ফোন করে জানাবে যে কোনো অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, এর প্রথম কারণ হচ্ছে মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব ও দ্বিতীয়ত সে সাহস করছে না।

সূত্র: অধিদপ্তরের কর্মকর্তা

জিআরএস ব্যবস্থায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদেও সম্পর্কে অভিযোগের চেয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত সংক্রান্ত অভিযোগই বেশি আসে। এছাড়া তিন মাসের মধ্যে অভিযোগ নিরসন না করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা যায়।[২৪]

২.৩.৬.২. অভিযোগ নিস্পত্তি করার প্রক্রিয়া

সাধারণ জনগণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে জমাকৃত অভিযোগ তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করা হয় এবং সেই কর্মকর্তা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যেমন সাধারণ জনগণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে নামর্মে অধিদপ্তর থেকে কারণ দর্শনোর নোটিশ পাঠানো হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নোটিশ পেলে সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে ক্ষেত্রবিশেষে মুচলেকা দিয়ে থাকে এই মর্মে যে সে আর এমন কাজ করবে না এবং তাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি না আসেন তবে তার বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে মামলা করা হয় বা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় অথবা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই তিন ভাগে তাদের অভিযোগ নিরসন করা হয়। অনেকসময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ও অভিযোগকারীর মধ্যে সমঝোতাও করে দেওয়া হয়। যেসব দূষণকারী ক্ষমতাবান এবং বেপরোয়া তাদের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

[২২] *প্রাগুক্ত।*
[২৩] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭.০২.২০২০।
[২৪] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭.০২.২০২০।

অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিরসনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। যেমন, যদি কেউ কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করে যে ছাড়পত্র বা অন্যান্য কোনো সেবা নেওয়ার সময় সে বা তারা হয়রানির শিকার হয়েছেন তাহলে সেই অভিযোগ প্রশাসনিক বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্রশাসনিকভাবে তদন্ত করার জন্য। যদি অভিযোগ সত্যি হয় তবে সেই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হবে। এই তদন্ত তাদের নির্ধারিত প্রশাসন শাখার মাধ্যমে করা হয়, অন্য কোনো কর্মকর্তা দিয়ে করানো হয় না। তদন্তের পরে সত্যতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় আর সত্যতা না মিললে তাকে স্ব-পদে বহাল রাখা হয়। এই চিঠিগুলো সাধারণত বেনামে আসার কারণে পরবর্তীতে আর অভিযোগকারী ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না। বেনামে চিঠি আসলেও অভিযোগ নিরসন কর্মকর্তাকে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে দেখার নির্দেশনা রয়েছে।[২৫]এছাড়াও আন্তঃবিভাগীয় কোনো অভিযোগ দাখিল হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ কর্মীদের মধ্যে বিবাদ হলে তারা নিজেরাই সেটা সমঝোতা করে নেয়। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে কেউ জড়াতে চায় না।[২৬]

তবে অভিযোগ গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও যোগাযোগের মাধ্যম দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শিত নেই। জিআরএসের মাধ্যমে অভিযোগ করতে চাইলে অনলাইনে সরাসরি অভিযোগটি অভিযোগ নিস্পত্তিকারী কর্মকর্তার কাছে চলে আসে। বিগত এক বছরের মধ্যে জনসাধারণের নিকট হতে কার্যালয় সম্পর্কিত (অভ্যন্তরীণ) ও (বহিস্থ) কোন অভিযোগ আসেনি। তবে বিগত এক বছরে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত **১৯২**টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে **১৮৪**টি অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ০৮টি অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

- অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ দূষণের দায়ে নোটিশ করা;
- অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান/কারখানাকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিবরণসহ লিখিত জবাব/ব্যাখ্যা চেয়ে পত্র প্রেরণ করা;
- পরিবেশ দূষণের দায়ে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা এবং ধার্যকৃত জরিমানার টাকা আদায় করা;
- পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করা।

২.৩.৭. গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের উপস্থিতিতে প্রতিমাসের প্রথম বৃহস্পতিবার জেলা কার্যালয়, দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বিভাগীয় কার্যালয় ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার সদর দপ্তরে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানিতে সাধারণ জনগণ, বিভিন্ন পরিবেশবাদি সংগঠনসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে থাকে। গনশুনানি অনুষ্ঠানের তারিখ, স্থান, বিষয় ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে, চিঠির মাধ্যমে এবং ফেসবুক পেইজে দেওয়া হয়। আগে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হলেও বর্তমানেসেটি করা হয়না।কারণ গনশুনানিতে জনসমাগম অনেক কম হলেওপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারে ৩০-৪৫ হাজার টাকা ব্যয় হয় এবং অর্থের অপচয় হয়।

গনশুনানিতে আনীত প্রত্যেকটি অভিযোগ প্রতিকার করার বিধান রয়েছে। অভিযোগ নিস্পত্তি না হলে পুনরায় অভিযোগ করতে হবে অথবা অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হবে। শুনানিতে অংশগ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত ফর্মে স্বাক্ষর, মোবাইল নম্বর, আলোচনা বা অভিযোগের বিষয় সম্পর্কে তথ্য দিতে হয়। মৌখিকভাবে অভিযোগ নিস্পত্তি না করা গেলে লিখিত অভিযোগ নিয়ে সেটা সমাধান করা হয়। এছাড়া আন্তঃবিভাগীয় কোনো অভিযোগ দাখিল হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সাথে যোগাযোগকরে সমস্যা সমাধান করা হয়।[২৭]

[২৫] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭.০২.২০২০
[২৬]তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭.০২.২০২০
[২৭]তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ০৪.০৩.২০২০।

২.৩.৮. তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিটি কার্যালয়ে তথ্য অনুসন্ধান কেন্দ্র আছে এবং সেখানে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা আছে। কিন্তু অধিদপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নামের তালিকা এবং নাগরিক সনদ প্রদর্শিত নেই।[২৮] সাধারণত বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। কিন্তু বিগত তিন বছরের প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত করা হয়নি। বার্ষিক প্রতিবেদনের বাইরে কোনো তথ্য প্রয়োজন হলে গ্রাহককে অধিদপ্তর থেকে সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করতে হয়। সাধারণ তথ্য মৌখিকভাবে দেওয়া হলেও লিখিত তথ্যের জন্য মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয় অথবা তথ্য অধিকার ফর্মের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়।[২৯] পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যালয়ে নিজস্ব ওয়েবসাইট নেই, শুধু একটি কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইট আছে। অন্যান্য দপ্তরগুলোর নিজস্ব ফেসবুক পেজ আছে যেখানে তারা নিয়মিতঅধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য উন্মুক্ত করে থাকে। ওয়েবসাইটে শুধু উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ও কর্মবিবরণী দেওয়া আছে। প্রতিটি কার্যালয়ে তথ্য অনুসন্ধান কেন্দ্র আছে। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন। সদর দপ্তরের অভ্যর্থনা ডেস্কে দুইজন কর্মকর্তা শিডিউল ভাগ করে কাজ করেন।[৩০]

সারণি-৭: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত ২০১৯ সালের কার্যক্রম

	২০১৯-২০	২০২০-২১
তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	৬৩টি	২৭টি
তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	৫৭টি	২৭টি
অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ	৬টি	প্রযোজ্য নয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	-	০২টি
আপীল নিস্পত্তির সংখ্যা	-	০২টি
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই।	প্রযোজ্য নয়
তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান	৬০২/- (ছয়শত দুই টাকা মাত্র)	১৫৪/- (একশত চুয়ান্ন) টাকা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে।	-

তথ্যসূত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর।

২.৩.৯. পরিবেশ অধিদপ্তরের অংশীজন

পরিবেশ অধিদপ্তরের অংশীজনদের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও স্থানীয় এবং আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অংশীজনদেরকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

[২৮]তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭.০২.২০২০
[২৯]তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ০৪.০৩.২০২০।
[৩০]প্রাগুক্ত, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ০৪.০৩.২০২০।

- **নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের:** পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, জাতীয় পরিবেশ কমিটি, জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
- **স্থানীয় বেসরকারি সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান:** বাংলাদেশে বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কাজ করে। এদের মধ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লয়ারস এসোসিয়েশান (বেলা), পরিবেশ আন্দোলন বাংলাদেশ (পবা), এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশান (এসডো), বাংলাদেশ ইয়ুথ এনভাইরনমেন্টাল ইনিশিয়েটিভ, ব্র্যাক, গ্রীনপিস, গ্রীন বাংলাদেশ, গ্রীন সেভার্স ইত্যাদি অন্যতম।
- **উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান:** পরিবেশ অধিদপ্তরকে পরিবেশ সুরক্ষা ও সংরক্ষণে কারিগরি সহায়তা দেওয়া জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন (ইউএনএফসিসি) এবং জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) অন্যতম। এছাড়াও বাংলাদেশের বন, পরিবেশ ও প্রাণসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কৌশল বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন, নরওয়ের উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা (নোরাড), ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সী ফর ইন্টার ন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট(ইউএসএআইডি), ডয়চে গেজেলশাফট ফার ইন্টারন্যাশনাল জুজামেনআরবাইট(জিআইজেড), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, গ্লোবাল এনভারনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি, বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকারিগরি সহায়তা প্রদান করে।
- **পরিবেশ ও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/ইউনিট:** (১) ইনস্টিটিউট ফর ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স; (২) পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট; (৩) সেন্টার ফর এনভারনমেন্টাল এণ্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশান সার্ভিসেস(সিইজিআইএস); (৪) ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং।

২.৩.১০. পরিবেশ অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ ও অর্জন

শুদ্ধাচার চর্চায় পুরস্কার/প্রণোদনা প্রদান

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বা ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি(এনআইএস) অনুযায়ী শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের একটি বেসিক বা মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা এবং সনদপ্রদান করা হয়। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায় তাদেরকে নানা ধরনের শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, যেমন চাকরি থেকেঅব্যাহতি(টার্মিনেশন), নিম্ন পদমর্যাদায় নামিয়ে দেওয়া অথবা প্রতি বছর জুন মাসে বেসিকের উপর যে ৫% যে প্রবৃদ্ধি হয় সেটা আটকে রাখা।[৩১]

নৈতিকতা কমিটির সভা

প্রত্যেক বিভাগ ও সদর দপ্তরে এনআইএস অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটি আছে। সাধারণত অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভাতে প্রত্যেক জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তারা থাকেন তাই এনআইএস ও অ্যানুয়াল পারফর্মেন্স এগ্রিমেন্টের (এপিএ) পাঁচটি টুলের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা যাচাই ও আলোচনা করা হয়।[৩২] নৈতিকতা কমিটির সভায় অধিদপ্তরের লক্ষ্য থাকে সকল কার্যালয়ে তিন মাসে একটি সভা ও বছরে ৪টি করে সভা পরিচালনা করার। তাছাড়া নৈতিকতা কমিটিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সেটি প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়।[৩৩]

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি নির্ধারিত প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে প্রতি বছর ৫ জুন পরিবেশ অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস পালন করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক স্লোগান প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা এবং পরিবেশ মেলা আয়োজন, গাছের চারা বিতরণ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুদে বার্তা প্রেরণ, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার আয়োজন, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারে আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচার, নির্বাচিত জাতীয় দৈনিকে বিশেষ

---

[৩১] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭.০২.২০২০।

[৩২] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭.০২.২০২০।

[৩৩] তথ্যদাতা,পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭.০২.২০২০।

ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ নানা কর্মসূচি পালন করে। এছাড়া প্রবন্ধ ও কবিতা সংবলিত স্মরণিকা ও জাতীয় পরিবেশ পদক এর পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

পরিবেশ পদক প্রদান

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করা হয়। শুরুতে চারটি শ্রেণীতেজাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান এবং জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণ পদক, সনদপত্র এবং ত্রিশ হাজার টাকা সম্মানী প্রদান করা হতো। এই চারটি ক্যাটাগরি হচ্ছে (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ; (খ) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ; (গ) পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন; এবং (ঘ) পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রচার।পরবর্তীতে ২০১১ সালে জাতীয় পরিবেশ পদকের সম্মানী পঞ্চাশ হাজার টাকায় উন্নীত করে জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা সংশোধিত হয়। সে মোতাবেক ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠান পর্যায়ে মোট ৬টি শ্রেণীতে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালের সংশোধিত জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা অনুযায়ী জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একুশ ক্যারেট মানের দুই তোলা ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্য এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক, ক্রেস্ট এবং সনদ প্রদান করা হয়।

পরিবেশ মেলা আয়োজন

পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে উদ্যোক্তাগণক উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিবছর পরিবেশ মেলার আয়োজন করে থাকে। দেশি বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিবেশ মেলায় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশবান্ধব পণ্য ও প্রযুক্তির প্রদর্শন করে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক

পরিবেশ অধিদপ্তর ধারাবাহিকভাবে “আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা” আয়োজন করে আসছে। প্রতি বছর বিতর্ক প্রতিযোগিতাটির চূড়ান্ত পর্ব বিটিভি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় যা ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়।

সমাবেশ ও শোভাযাত্রা আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তর জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনসংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা উদ্বুদ্ধকরণ সমাবেশ ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

হাজারিবাগের চামড়া শিল্প সাভারে স্থানান্তর

পরিবেশ অধিদপ্তর চামড়া শিল্পকারখানাসমূহকে স্থানান্তরের জন্য শিল্প মালিকদের তাগাদা প্রদানপূর্বক শিল্প স্থানান্তর বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়কে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। এ ছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর হাজারীবাগস্থ চামড়া শিল্প মালিকদের সাভারে শিল্প স্থানান্তরের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করে শিল্প বর্জ্য হতে নদী দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর Zero Discharge নীতি গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়: পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনি কাঠামো

৩.১ পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনি কাঠামো

পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশের পরিবেশের স্বার্থরক্ষার্থে পরিবেশ অধিদপ্তর বেশকিছু আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী এর উপর ন্যাস্ত আইন প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৩.১.১. সাংবিধানিক স্বীকৃতি

পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদে[৩৪] বলা হয়েছে, ‘রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন’। সুতরাং সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

৩.১.২. পরিবেশ সংক্রান্ত আইন

৩.১.২.১. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

‘বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫’[৩৫]-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (ধারা নম্বরসহ) এখানে উল্লেখ করা হলো:-

- বাংলাদেশ সরকারকে পরিবেশ অধিদপ্তর স্থাপন করার এবং এর প্রধান হিসেবে একজন মহা-পরিচালক নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ (ধারা ৩);
- মহাপরিচালক বা তার নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিষিদ্ধ ক্ষতিকর গ্যাস বা ধোঁয়া নিঃসরণকারী যানবাহনকে আটক, পরীক্ষা করা, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বাজেয়াপ্তকরণ ও আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষমতা (ধারা ৬);
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী গেজেটের মাধ্যমে সারাদেশে বা কোনো নির্দিষ্ট এলাকাতে উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা (ধারা ৬ক);
- ছাড়পত্র ব্যতীত পাহাড় ও টিলা কাটা ও/বা মোচন করা ও জলাধার হিসেবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (ধারা ৬খ);
- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ (ধারা ৬গ);
- প্রতিবেশ ব্যবস্থা/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে মহাপরিচালকের নির্দেশে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণ দিতে, ফৌজদারী বা উভয় প্রকার মামলা দায়ের করার ক্ষমতা (ধারা ৭);
- বিধি মোতাবেক প্রক্রিয়ার দ্বারা যে কোনো কারখানা, প্রাঙ্গন বা স্থান হতে বায়ু, পানি, মাটি বা অন্যান্য নমুনা সংগ্রহকরণ (ধারা ১১);
- পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনা বা প্রকল্প গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ (ধারা ১২);
- আইনের বিধানাবলী লঙ্ঘন বা নির্দেশ অমান্য করলে সর্বনিম্ন ৫ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং অন্যূন ১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড প্রদান (ধারা ১৫)।

---

[৩৪] রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367/section-41505.html?lang=enসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৩৫] বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-791.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

৩.১.২.২. মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯

মোবাইল কোর্ট আইনের[৩৬] ধারা ৫ অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সময় কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়ার পরপরই দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত অভিযোগ লিখিতভাবে গঠন করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ স্বীকার করেন কি না জানতে চাইবেন এবং স্বীকার না করলে কারণসহ ব্যাখ্যা জানতে চাইবেন। অপরদিকে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করলে তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে সেখানে অভিযুক্তের স্বাক্ষর এবং দুইজন উপস্থিত স্বাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক যথোপযুক্ত দণ্ড আরোপ করে লিখিত আদেশ প্রদান করবেন। প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হলে, তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান অথবা প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে অভিযোগটি বিচারার্থে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করতে পারবেন (ধারা ৭)। এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ বাহিনী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্টসরকারি কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চাইলে অবিলম্বে সহায়তা প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটসংশ্লিষ্টঅপরাধ তদন্তের জন্য জব্দ এবং প্রয়োজনে জব্দকৃত বস্তুনষ্ট করার ক্ষমতা রাখেন (ধারা ১২)।

৩.১.২.৩. পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০

এই আইনের[৩৭] উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রতিটি জেলায় এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং একজন বিচারকের (যুগ্ম-জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা) সমন্বয়ে প্রত্যেক জেলা সদরে আদালত গঠন করা হবে। কোনোজেলায় একাধিক আদালত স্থাপিত হলে প্রত্যেক পরিবেশ আদালতের জন্য এলাকা নির্ধারণ করে দিতে হবে (ধারা ৪)। তাছাড়া এই আইন সঠিকভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠা করা যাবে এবং আইন সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিচার করার জন্য কোনোমেট্রোপলিটন ম্যজিস্ট্রেট বা ১ম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে এককভাবে বা তার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট রূপে নিয়োগ দেওয়ার বিধান রয়েছে(ধারা ৫)। সেইসাথে জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বা কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জন্য জেলা ও দায়রা জজকে তাঁর দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে বিচারকের দায়িত্ব দিয়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা এক বা একাধিক পরিবেশ আপিল আদালত স্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে (ধারা ২০)।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে অপরাধীকে অনধিক ৫ বছর কারাদণ্ড বা ৫ লক্ষ টাকা জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যাবে (ধারা ৮)। অভিযোগ গঠনের তারিখ হতে ১৮০ দিনের মধ্যে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করবে (ধারা ১০ উপধারা ২) এবং এই সময়সীমার মধ্যে বিচারকাজ সমাপ্ত না হলে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে কারণ উল্লেখ করে বিষয়টি পরিবেশ আপিল আদালতকে অবহিত করতে হবে ও পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে মামলার বিচার কাজ সমাপ্ত করতে হবে।এই বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি কোনো মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন না হয় তবে সংশ্লিষ্ট মামলা অন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করার জন্য পরিবেশ আপিল আদালতে আবেদন করা যাবে (ধারা ১০ উপধারা ৩)।

---

[৩৬] মোবাইল কোর্ট আইন (২০০৯), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1025.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৩৭] পরিবেশ আদালত আইন (২০১০),পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1061.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

৩.১.২.৪. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

এই আইনের[৩৮] পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসকের ছাড়পত্র ও অনুমোদন ছাড়া ইট তৈরির জন্য কৃষিজমি, পাহাড়, টিলা, মজা পুকুর, খাল, বিল, খাঁড়ি, দিঘি, নদ-নদী বা পতিত জায়গা থেকে মাটি কাটা নিষিদ্ধ (ধারা ৫)। এছাড়া ৫(৩) ধারায় ইটের কাঁচামাল হিসেবে মাটির ব্যবহার হ্রাস করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ইট ভাটায় নির্দিষ্ট হারে ফাঁপা ইট (Hollow Brick) প্রস্তুত করার নির্দেশনা রয়েছে। ইট ভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (ধারা ৬)। আইনানুযায়ী আবাসিক, সংরক্ষিত বা বাণিজ্যিক এলাকা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর, সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বন, অভয়ারণ্য, বাগান বা জলাভূমি, কৃষি জমি, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ও ডিগ্রেডেড এয়ার শেডে কোনো ইট ভাটা স্থাপন করা যাবেনা (ধারা ৮)। যদি কোনো ব্যক্তি এই আইন লজ্ঘন করে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া ইটভাটা স্থাপন, পরিচালনা বা চালু রাখেন ও ইট উৎপাদন করেন তাহলে তিনি সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড বা ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন (ধারা ১৪)।

৩.১.২.৫. বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭

এই আইনে[৩৯] জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়েও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা দল বা সমিতি গঠন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো- কৌলিক বা জীবসম্পদের ন্যায্য হিস্যা বন্টন; জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণা ও জীববৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ; তহবিল গঠন, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন; অপরাধ তদন্ত করে বিচার প্রদান ও দণ্ড আরোপ ইত্যাদি।

৩.১.৩. পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা

৩.১.৩.১. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা[৪০] দ্বারা পরিবেশ অধিদপ্তরকে বিশেষ কিছু ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, যেমন- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা (বিধি ৩), ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী মোটরযান সম্পর্কিত ব্যবস্থা (বিধি ৪), পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান (বিধি ৭)। এ ছাড়াও বিধি ১২ এর অধীনে বায়ু, পানি, শব্দ, এবং ঘ্রাণসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের পরিবেশগত মানমাত্রা, তরল বর্জ্য নির্গমন এবং গ্যাসীয় বর্জ্য নিঃসরণের পরিসীমা (বিধি ১৩),পরিবেশ ছাড়পত্র ও নবায়ন ফি (বিধি ১৪), বিভিন্ন সেবা ও তার ফি (বিধি ১৫) ইত্যাদি তফসিল আকারে বর্ণনা করা আছে। এছাড়াও ধারা ১৪ এর অধীনে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বা বিধি অনুসারে প্রদত্ত কোনোনোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আপিল করার বিধান রয়েছে (বিধি ৯) এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি (বিধি ১০) ও আপিল শুনানীকালীন পদ্ধতি (বিধি ১১) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.১.৩.২. ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪

এই বিধিমালাতে[৪১] পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী হিসেবে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, মজুদ, বিতরণ বা বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া আছে। বিধিমালাটিতে মোট ৯টি তফসিলের মাধ্যমে যথাক্রমে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের বিবরণ, ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন,

---

[৩৮] ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন (২০১৩), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1140.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৩৯] বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1203.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৪০] পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭),পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/5a9d6a31_d858_4001_b844_817a27d079f5/ECR%201997.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৪১] ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা(২০০৪),পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/b0928f6a_53c4_4af2_a444_49804c923fbd/ODS%20Rules%2C2004%20-%20Combiend.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

আমদানি, রপ্তানি, ব্যবহার ও প্রান্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত মন্ট্রিল প্রটোকলের সদস্য দেশসমূহের তালিকা, এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য ফরম সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩.১.৩.৩. শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬

এই বিধিমালা[৪২] অনুযায়ী, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নিজ নিজ এলাকায় আবাসিক, বাণিজ্যিক, মিশ্র, শিল্প বা নীরব এলাকা চিহ্নিত করে স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (বিধি ৪)। কতিপয় অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া (বিধি ৯) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো এলাকায় শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম করতে পারবে না (বিধি ৭)। সেইসাথে নীরব এলাকায় চলাচলকালে যানবাহনে কোনো প্রকার হর্ন বাজানো যাবে না (বিধি ৮/২)। এছাড়াও আবাসিক এলাকার শেষ সীমানা হতে ৫০০ মিটারের মধ্যে ঐ এলাকায় নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ইট বা পাথর ভাঙ্গার মেশিন ব্যবহার করা যাবে না এবং সন্ধ্যা ৭টা হতে সকাল ৭টা পর্যন্ত মিকচার মেশিনসহ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালানো যাবে না (বিধি ১১/১)। উচ্চমাত্রায় শব্দ সৃষ্টিকারী কারখানায় কর্মচারীদের শব্দ দূষণজনিত ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য কারখানা মালিক বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে (বিধি ১৪/১)।

৩.১.৩.৪.চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮

এই বিধিমালার[৪৩] বিধি ৩ মোতাবেক গঠিত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে চিকিৎসাবর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও প্রয়োজনে বাতিল করা; চিকিৎসাবর্জ্যের দ্বারা সংঘটিত পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ, প্রচার ও এই ধরনের অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং দখলদার কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বছর ৩১ মার্চের মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকরা (বিধি ৪)। সিটি কর্পোরেশান ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনার ক্ষেত্রে লাইসেন্স নিতে হবে (বিধি ৫)। চিকিৎসাবর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজয়াতকরণের জন্য প্রতিটি চিকিৎসাসেবা স্থলে 'কালার কোড' সংবলিত পৃথক পৃথক পাত্র ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (বিধি ৭/২)। কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডেদণ্ডনীয় হবে (বিধি ১১)।

৩.১.৩.৫.বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১

এই বিধিমালা[৪৪] অনুযায়ী, বিপজ্জনক বর্জ্য বা পদার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকারী তৎসংশ্লিষ্ট কাজ শুরু করার অন্তত ৬০ দিন পূর্বে নির্দিষ্ট ফরমে উল্লেখিত তথ্য সংবলিত একটি প্রতিবেদন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট জমা দিবেন (বিধি ৬)। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা পাইপলাইন চালু হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক পরিচালনাকারী সম্ভাব্য দুর্ঘটনার প্রকৃতি, সময় ও দুর্ঘটনার পর করণীয় ও অকরণীয় সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে ব্যপক প্রচার প্রচারণা পরিচালনা করবে (বিধি ৯)। বিপজ্জনক পদার্থ আমদানি বা রপ্তানির পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছ থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে (বিধি ১৪), কারণ এই ছাড়পত্র ব্যতীত কোনো বিপজ্জনক পদার্থ আমদানি বা রপ্তানির লাইসেন্স প্রদান করা হবে না (বিধি ১৬)। তাছাড়া বিপজ্জনক পদার্থ আমদানিকারক ও রপ্তানিকারককে বাসেল কনভেনশনের শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে (বিধি ১৭)। জাহাজ ভাঙ্গার জন্য আমদানিকৃত বা বাছাইকৃত বা

---

[৪২] শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা (২০০৬),পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/e43886bc_0694_49f6_80f3_71d2a0edece1/Noise%20Control%20Rules.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৪৩] চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা (২০০৮), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://www.poribesh.com/wp-content/uploads/2015/08/Medical-Waste-Management-Processing-Rules-2008-Bangla.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৪৪] বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১১), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://www.poribesh.com/wp-content/uploads/2015/08/Hazardous-Wastes-and-Ship-Breaking-Waste-Management-Rules-2011-Bangla.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

ধার্য প্রতিটি জাহাজ ভাঙ্গার কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে এবং ছাড়পত্র গ্রহণকারী জাহাজ ইয়ার্ড ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে ভাঙ্গা যাবে না (বিধি ১৯)। শুধুমাত্র ছাড়পত্রধারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে ধাতব বর্জ্য (লৌহজাত নয় এমন) বা ব্যবহৃত তেল বা বর্জ্য তেল কমপক্ষে ১২০ দিনের জন্য বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাবে। মাত্রা বহির্ভূত বর্জ্য তেল পরিবেশগত ছাড়পত্রধারী বিপজ্জনক বর্জ্য পোড়ানোর অঙ্গারিণীতে (Incinerator)পুড়িয়ে নিস্পত্তি করতে হবে। প্রত্যেক বিপজ্জনক বর্জ্য সৃষ্টিকারী, পুনর্ব্যবহারোপযোগীকারী এবং পুনঃপরিশোধনকারীকে অবশ্যই পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি বা প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে (বিধি ২০)।

৩.১.৩.৬.বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২

এই বিধিমালা[৪৫] অনুযায়ী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কৌলিকগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি আমদানি, রপ্তানি, বেচাকেনা বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। তবে এ সম্পর্কিত কোনো গবেষণা পরিচালনা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুধু গাইডলাইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে এবং গবেষণালবদ্ধ ফলাফল বাজারজাত করার পূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে (বিধি ৩/১)। কৌলিকগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি বহনকারী বাক্স বা মোড়কের উপর এর বিস্তারিত পরিচিতিযুক্ত লেবেলিং থাকতে হবে (বিধি ৫) এবং এধরনের জীব বা দ্রব্যাদির দ্বারা যদি পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানবস্বাস্থ্যের কোনো প্রকার হুমকি বা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তবে তার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে (বিধি ৭/১) এবং দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনানুগ যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে (বিধি ৭/৩)। এই আইন অমান্যকারীদের সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে (বিধি ১০/১)।

৩.১.৩.৭.প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬

এই বিধিমালা[৪৬] অনুযায়ী, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার পূর্বে ঐ এলাকা সংকটাপন্ন হওয়ার কারণ ও সম্ভাব্য হুমকি, বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য, দূষণ ও অবক্ষয়, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা, অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে (বিধি ১৮)। কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক বা খনিজ সম্পদ বিষয়ে অনুসন্ধান, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনা করতে চাইলে তাকে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক হলে অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ফি দিতে হবে (বিধি ২৬)। কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার কোনোবিধান লঙ্ঘন করলে সেটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অপরাধীকে সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

৩.১.৪. নীতিমালা

৩.১.৪.১.জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮

বাংলাদেশের জাতীয় পরিবেশ নীতিতে[৪৭] প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের চাপ কমিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অভিযোজন এবং প্রশমন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ, *Polluter's Pay Principle*প্রয়োগ করে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়করণসহ নানা বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। যেহেতু পরিবেশ একটি সামগ্রিক বিষয় এবং দেশের সকল অঞ্চল ও উন্নয়ন খাত জুড়ে এর পরিধি বিস্তৃত

---

[৪৫] বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা (২০১২), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://www.poribesh.com/wp-content/uploads/2015/08/Bangladesh-Biosafety-Rules-2012-Bangla.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৪৬] প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা(২০১৬), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://www.doe.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/notices/db120080_4378_41af_977a_e96ada5586d1/ECA%20Rules_25-09-16.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৪৭]জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৮), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

তাই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের উপাদানসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতে প্রতিটি খাত/ক্ষেত্রভিত্তিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সেইসাথে প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

৩.১.৪.২.প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), ২০২০

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)[৪৮] অনুযায়ী, ২০৪১ সালের মধ্যে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশের বসবাস নগরাঞ্চলগুলোতে এবং জীবনযাত্রার মান উচ্চ-আয় অর্থনীতিতে পরিবর্তিত করা হবে যেখানে প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনসংখ্যার চাহিদার মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য বজায় থাকবে। বিশেষ করে পরিবেশগত প্রশাসন এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যেখানে প্রণোদনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির চমৎকার মিশ্রণ ঘটবে।এরই ধারাবাহিকতায় দূষণকারীদের নিকট ক্ষতিপূরণ আদায়ের নীতি এবং পরিবেশগত নীতি ও কর্মসূচির বিকেন্দ্রীকৃত বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।রূপকল্প ২০৪১ কে সামনে রেখে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নে কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন শহুরে জনগোষ্ঠীর জন্য শতভাগ ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ৫০ ভাগ নিরাপদ ট্যাপের পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, নগর ও গ্রামীণ উভয় ক্ষেত্রে শতভাগ নিরাপদ বর্জ্য অপসারণ সংযোজন, মোট জিডিপির ৩.৫% পরিবেশগত ব্যয়, বায়ুমানের বার্ষিক গড় ১০পিপিএমে নামিয়ে আনা, পরিবেশগত পরিকৃতি সূচক ও আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ ৩০% উঠে আসা ইত্যাদি।

৩.১.৪.৩.অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়[৪৯] পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো নগরীতে বর্জ্য পানি পরিশোধন সুবিধার হার ৫০% বৃদ্ধি, পরিবেশ খাতে প্রধান প্রধান বিনিয়োগসমূহ মোট জিডিপির ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি, পরিবেশগত বিষয়সমূহ সমন্বয়কারী সংস্থার বিনিয়োগ মোট জিডিপির ০.১ শতাংশ বৃদ্ধি, দূষণকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় নীতির প্রয়োগ মোট দূষণের ঘটনার ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ, জ্বালানি দামের ৫% হারে কার্বন কর আরোপ, বায়ুর মানের বার্ষিক গড় হ্রাস করে ৬০µg/m3 (PM 2.5) তে নিয়ে আসা, অবক্ষয়ের শিকার হওয়া মোট ভূমির হার ১২ শতাংশে কমিয়ে আনা, মোট ভূমির ১৫.২% বন দ্বারা আচ্ছাদিত করা, পরিবেশগত কর্মসম্পাদন সূচক ও বসতি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ ৫০% এ উঠে আসা ইত্যাদি।

৩.২. বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা, প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও প্রভাব

বাংলাদেশ পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও বিধি'র সীমবাদ্ধতা, প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও তার প্রভাব নিয়ে উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

৩.২.১. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

এই আইনের[৫০] ধারা ৩(২) তে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মহাপরিচালক নিয়োগে চাকুরির শর্ত ও যোগ্যতা, যেমন দুর্যোগ সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি, বিষয়গুলো নির্ধারণ না করায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের সুযোগ রয়েছে এবং বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃত্বের ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ৫নং ধারায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার কথা বলা হলেও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণ করার এখতিয়ার না থাকায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সন্নিকটে ভারী শিল্প কারখানাসহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। ধারা ৬(ক) তে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হলেও সিঙ্গেল ইউজ

---

[৪৮]প্রেক্ষিত পরিকল্পনা(২০২১-২০৪১), প্রকাশিত ২০২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, , বিস্তারিত দেখুন: https://plancomm.portal.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/8a4a19a2_ad6c_4de3_a789_15533b6a9a10/2020-08-31-16-09-91ffa489d550d61d313e3142db4fe43c.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৪৯] অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://plancomm.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/68e32f08_13b8_4192_ab9b_abd5a0a62a33/2021-02-03-17-04-ec95e78e452a813808a483b3b22e14a1.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৫০] বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-791.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

প্লাস্টিক ও লেমিনেটেড প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হয় নি। ফলে পলিথিনের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে না পারার কারণে প্লাস্টিক দূষণ অব্যাহত রয়েছে।

৩.২.২. মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯

পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এণ্ড এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনায় মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯[৫১] গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রায়ই পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়োগপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। আইনে আছে অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যদি অপরাধ স্বীকার না করে তবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাস্তি দিতে পারবেন না [ধারা ৬(১)]। ফলস্বরূপ, আইন সম্পর্কে অবগত দূষণকারীরা প্রায়শই অভিযোগ/অপরাধ অস্বীকার করায় তাদের মোবাইল কোর্টের আওতায় বিচার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

৩.২.৩. পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০

এই আইনের[৫২] অধীনে প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান থাকলেও বর্তমানে সারাদেশে মাত্র তিনটি পরিবেশ আদালত ও একটি পরিবেশ আপিল আদালত রয়েছে [ধারা ৪(১)]। এতে করে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত মামলার বিচারে বিলম্বের পাশাপাশি মামলা পরিচালনায় বাদি-বিবাদিদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। মহাপরিচালক বা তাঁর কাছ হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরাসরি মামলা দায়ের করতে পারলেও সাধারণ মানুষ মামলা করতে পারে না [ধারা ৬(১)], ফলে এটি জনবান্ধব আইন হিসেবে বিবেচিত নয় বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রদান করেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শকের লিখিত প্রতিবেদন ছাড়া পরিবেশ আদালত কর্তৃক কোনো ক্ষতিপূরণের দাবি বিচারের জন্য **গ্রহণ** করতে না পারায় [ধারা ৭(৪)] ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সরাসরি মামলা করা ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে **প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি** হয়। পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করার প্রাথমিক দায়িত্ব এবং মামলা তদন্তের ভার পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর। আইনে প্রত্যেক জেলায় পরিবেশ আদালত স্থাপনের বিধান থাকলেও কার্যত পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় বা অফিস রয়েছে কেবল ২২টির মতো জেলায়। তাই দপ্তর ও লোকবলের অপ্রতুলতা সকল জেলায় পরিবেশ আদালত স্থাপন বিঘ্নিত করছে।[৫৩]

৩.২.৪. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

২০১৩ সালে আইনটি[৫৪] প্রণীত হলেও এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন দৃষ্টিগোচর নয় এবংআইনটিপ্রায়শঃইলঙ্ঘিত হলেও আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানআইনের ধারাগুলো কার্যকরপ্রয়োগনিশ্চিতকরছে না। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত-২০১৯)-এর ৪ ধারা অনুযায়ী লাইসেন্স ছাড়া কোনো ইটভাটা চালানো যাবে না। এর ব্যত্যয় হলে দুই বছর কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। এ ছাড়াও ইটভাটা নির্মাণের আগে পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই, স্থানীয় ভূমি অফিসসহ সরকারি কয়েকটি সংস্থার ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক। কাগজে-কলমে এমন নিয়ম থাকলেও উপরের ধারাগুলোঅধিকাংশ ইটভাটা মালিকঅনুসরণ করে না। প্রশাসনের কঠোরতার অভাবকে পুঁজি করে এই ধরনের অবৈধ ইটভাটাগুলো চালু রয়েছে ।[৫৫,৫৬]

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫-এ ইট তৈরিতে নিষিদ্ধ মাটির উৎস হিসেবে "কৃষিজমি" বলতে দুই বা তার বেশি ফসলি জমির উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে একফসলি উর্বর কৃষি জমির মাটি কেটে ইট তৈরি অব্যাহত রয়েছে।[৫৭] এই আইনের প্রয়োগ না হওয়ায় কৃষি ও উর্বর জমির উপরিভাগের মাটি কেটে ইট তৈরি অব্যহত থাকায় মাটি উর্বরতা শক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা

---

[৫১] মোবাইল কোর্ট আইন (২০০৯), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1025.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৫২] পরিবেশ আদালত আইন (২০১০), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1061.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৫৩] পরিবেশের মরণবেশ:আইনে সংকট প্রয়োগও তথৈবচ, বিডিনিউজ২৪.কম, বিস্তারিত দেখুনঃhttps://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/36323 সর্বশেষ ভিজিট: ০৯.১২.২১।

[৫৪]ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন (২০১৩), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1140.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৫৫] দৈনিক সমকাল, ২৯ জানুয়ারি, ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন:https://bit.ly/3FPjL5Y

[৫৬]যুগান্তর, ১২ ডিসেম্বও ২০২০, বিস্তারিত দেখুন:https://bit.ly/32P5jwm

[57]যুগান্তর, ১০ জানুয়ারি ২০২১,বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3pKJjf6

হারাচ্ছে। এছাড়া ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলেও [ধারা ৬] কাঠের ব্যবহার অব্যহত রয়েছে। ধারা ৩(ক)-তে আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার ও ফসলি জমির এক কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ হলেও ইটভাটাগুলো গড়ে উঠছে ফসলি জমি দখল করে লোকালয়ের পাশ ঘেঁষে। ২০১৯ সালে আইনটি সংশোধিত করে ধারা ৫(৩ক) যোগ করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রজ্ঞাপন জারি করে মাটির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাসকল্পে সকল সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে পোড়ানো ইটের বিকল্প হিসেবে শুধুমাত্র সরকারি নির্মাণ কাজে পোড়ানো ইটের বিকল্প হিসেবে ব্লক ইটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন নির্মাণ কাজে ব্লক ইটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক না হওয়ায় বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন নির্মাণ কাজে ব্লক ইটের ব্যবহার ও প্রসারে ঘাটতি রয়েছে এবং কৃষি ও উর্বর জমির উপরিভাগের মাটি কেটে ইট তৈরি অব্যাহত রয়েছে। ফলে মাটির ব্যবহার হ্রাসে সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়ার আশংকা রয়েছে।

৩.২.৫. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

এই বিধিমালার[৫৮] বিধি ১৩ অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্প ও শিল্পকারখানাগুলো কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় বর্জ্য পরিবেশে উন্মুক্ত না করার নির্দেশনা থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত মাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাত্রা নির্ধারণ করা হয় নি। ফলে বিভিন্ন প্রকল্প ও শিল্পকারখানা থেকে নির্ধারিত মাত্রার চেয়েও বেশি মাত্রায় বর্জ্য নিঃসরণ হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিধি ৭(২) অনুযায়ী আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন না করার নির্দেশনা থাকলেও পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ফলে শব্দ, পানি ও বায়ু দূষণসহ সরকারি সম্পত্তির (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস) অপব্যবহার এবং যে কোনো মুহূর্তে ভবন ধস, অগ্নিকাণ্ডসহ রয়েছে নানা দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য সকল শ্রেণির শিল্প কারখানার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে অনাপত্তিপত্র নেওয়া আবশ্যক [বিধি ৭(৬)] হলেও এটি ছাড়াই পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সুযোগ পেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিষিদ্ধ স্থানে শিল্প কারখানা স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

৩.২.৬. শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬

এই বিধিমালার[৫৯] বিধি ৪ এ প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ এলাকার মধ্যে আবাসিক, বাণিজ্যিক, মিশ্র, শিল্প বা নীরব এলাকা চিহ্নিত করে স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের কোনো কর্মকাণ্ড এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। এমনকি রাজধানী ঢাকাতেও এমন এলাকা চিহ্নিত করে স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন করায় ঘাটতি রয়েছে শুধু কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের সামনে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সাইনবোর্ড দেখা গেলেও সেগুলো উপযুক্ত স্থানে স্থাপন না করায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে উপযোগিতা হারাচ্ছে। সাধারণ জনগণ শব্দ দূষণের কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় এবং আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে বেপরোয়াভাবে আইন লঙ্ঘন করছে।

এই বিধির তফসিল ১-এ বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক শব্দের মানমাত্রা দেওয়া আছে ও তফসিল ২-এ মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের অনুমোদিত মানমাত্রা উল্লেখ আছে। কিন্তু দেশে বিদ্যমান অন্যান্য ক্ষতিকর শব্দ উৎপন্নকারী উৎস যেমন জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডে উৎপন্ন শব্দের জন্য কোনো মানমাত্রা উল্লেখ নেই। জাহাজভাঙ্গা শিল্পের বৈশিষ্ট্য বা ধরনই বলে দেয় এখানে শব্দ দূষণ ও কম্পন নিয়মিত ঘটনা। প্রতিনিয়ত লোহার প্লেটগুলো কাটা, লোড-আনলোড এবং জাহাজের কাটা অংশ তীরে টেনে আনার সময় শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে। শব্দদূষণের ফলে স্কুল-কলেজের পাঠদানব্যাহত হয় ।এছাড়াও শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালার বিধান অমান্য করলে সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান করা হয়েছে[বিধি ১৮(২)], যা লঘুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। লঘু শাস্তির বিধান থাকায় একই অপরাধের পুনরাবৃত্তিসহ আইনকে হালকাভাবে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়।

[৫৮]পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭),পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/5a9d6a31_d858_4001_b844_817a27d079f5/ECR%201997.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

৩.২.৭. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬

এই বিধিমালায়[৬০] প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কর্মপ্রক্রিয়া শুরু না করা বা চালু না রাখার নির্দেশনা থাকলেও বেসরকারি ও সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প এ ধরনের এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যেমন রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে একেবারে সুন্দরবনে কোল ঘেঁষে; মাতারবাড়িকয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন কক্সবাজার-টেকনাফ উপকূলবর্তী মহেশখালী উপজেলাতে। রাজধানী ঢাকার চারপাশে চারটি (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ) নদীকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ঘোষণা করার পরেও দখল, বালু উত্তোলন চলছে, এমনকি খোদ সিটি কর্পোরেশন ও ওয়াসা কর্তৃক সুয়ারেজ বর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য ফেলা হচ্ছে।বুড়িগঙ্গা নদী পরিবেশগত বিপন্ন এলাকা হলেও এই নদী রক্ষায় কেউ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। আইনে বলা আছে যে বিপন্ন এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না। কিন্তু এটা জানার পরেও যখন সরকারসহ জনগণ এই আইন মানে না তখন ঐ আইনটি বাতিলের খাতায় নাম লেখায়।[৬১]

৩.৩. পরিবেশ আইন প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জসমূহ

৩.৩.১. আদালত সংকট

পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ অনুযায়ী দেশের প্রত্যেকটি জেলায় এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সারাদেশে মাত্র তিনটি পরিবেশ আদালত রয়েছে ও একটি পরিবেশ আপিল আদালত রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে তিনটি পরিবেশ আদালত এবং একটি পরিবেশ আপিল আদালত রয়েছে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত ভবনে। আদালত সংকটের কারণে অন্যান্য জেলা ও বিভাগের ভুক্তভোগীরা মামলা করতে নিরুৎসাহিত হন এবং বিচার পেতে বিলম্ব হয়।

৩.৩.২. আদালতের চেয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রাধান্য

পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন অপরাধের বিচার করতে নির্দিষ্ট আদালত থাকলেও ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিচার করাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে তথ্য দাতারা জানান। পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা করে দূষণ ও দখলকারীদের কঠোর সাজা নিশ্চিতে আগ্রহী নয়। ভ্রাম্যমানআদালত পরিচালনারমাধ্যমে যে জরিমানা করা হয়, তার বড় অংশই আবার আপিল করে ছাড় পান দূষণকারীরা। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের মামলায় কারাদণ্ড কম। বেশির ভাগ মামলায় আদালত আসামিদের আর্থিক দণ্ড দেয়। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ আদালত আসামিদের তাৎক্ষণিক কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড করায় দিন দিন মামলার সংখ্যা কমছে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্য দাতারা জানান।

৩.৩.৩. আইনি জটিলতা

পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নানা আইনি জটিলতা রয়েছে। একজন ভুক্তভোগী এখানে সরাসরি মামলা করতে পারেন না।পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া পরিবেশ আদালতে কোনো মামলা করা যায় না। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করতে হলে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে অভিযোগকারীকে আবেদন করতে হয়। কর্তৃপক্ষ অভিযোগ যাচাই-বাছাই করে সন্তুষ্ট হলে ৬০ দিনের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী মামলা করার অনুমোদন দেয়। আইনের এসব শর্ত পূরণ করে কোনো বিচারপ্রার্থী এখানে আসতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। এসব করণেই এ আদালতে মামলা কম হচ্ছে।বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কারণে প্রতিদিন পরিবেশ দূষণ হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হচ্ছে না।

৩.৩.৪. নিয়মিত তদন্ত প্রতিবেদন জমা না দেওয়া

অধিদপ্তর ও আদালতের কাজে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। মামলা তদন্তে দীর্ঘসূত্রতা ও বিচার বিলম্বিত হয়। নিয়ম অনুযায়ী পরিবেশ আদালতে মামলা হওয়ার পর পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে প্রতিটি মামলার প্রতিবেদন চাওয়া হয়; কিন্তু মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও যথাসময়ে প্রতিবেদন দেওয়া হয় না। ফলে ভুক্তভোগীদের আদালতে করা মামলাগুলো নিষ্পত্তিও হয় না।আদালত থেকে যেসব মামলা

[৬০] প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা(২০১৬), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://www.doe.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/notices/db120080_4378_41af_977a_e96ada5586d1/ECA%20Rules_25-09-16.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

[৬১] তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ০৬.০৭.২০২০।

তদন্তে দেওয়া হয়েছে সেসব মামলায় বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তদন্ত কর্মকর্তারা অভিযোগপত্র দাখিল করে না। আর এতে মামলার বিচারে অনেক বিলম্ব হয়। অনেকক্ষেত্রে বাদি মামলার আগ্রহ হারিয়ে আর আদালতে আসেন না।

৩.৩.৫. আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবহেলা

বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বা বিধি আইন প্রণয়নকারীদের আত্মোপলব্ধি থেকে তৈরিকরার চেয়ে বরং বাহ্যিক চাপ, দাতা সংস্থাদের চাপ, লোক দেখানো বা শুধু দায়িত্বের দিক বিবেচনা করেই করা হয়েছে।[৬২]যেমন, বাংলাদশে পূর্বে ইআইএ ব্যবস্থা চালু ছিলো না, পরবর্তীতে উন্নয়ন সহযোগীদের পরামর্শে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়।[৬৩]এখানে আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পরেও নানাধরনের অযৌক্তিক কারণে বিলম্ব করা হয়।[৬৪]স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো আইন প্রণয়ন করা হয় না, কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দ্বিগুণ উৎসাহে সেটা নিয়ে গবেষণা করা হয় কিন্তু আগেভাগেই সচেতনভাবে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না।[৬৫]তাছাড়া পরিবেশ আইনের কিছু অস্পষ্টতা আছে। যেমন, দায়িত্বপ্রাপ্তদের ইসিএ করার ক্ষমতাদেওয়া আছে কিন্তু তাদের সেটা প্রয়োগ করার মতো যোগ্যতা নেই। অর্থাৎ আইন প্রণেতারা ইসিএ করার ক্ষমতা প্রদান করেছে কিন্তু সেটা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের কী ধরনের যোগ্যতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকাপ্রয়োজন সেটার কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি।[৬৬]

ঘোষণা করে আইন প্রণয়ন করার পরে সেগুলো বাস্তবায়নে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা, জলাভূমি রক্ষা আইন, কৃষিজমি রক্ষা আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ইটভাটা আইন ইত্যাদি কোনোটাই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। যে যার মতো করে এই আইনগুলো অমান্য করছে এবং যার ক্ষমতা আছে সেই কেবলমাত্র এই আইনগুলো ভাঙছে অর্থাৎ যখন যিনি সরকারি ক্ষমতায় থাকছেন তখন তিনি তার মতো করে আইনগুলো চিন্তা করছেন বা সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা প্রভাব বিস্তার করে এগুলোকে তোয়াক্কার বাহিরে রেখে কাজ করছেন।[৬৭]একজন তথ্যদাতার মতে, “বিদ্যমান পরিবেশ আইন আসলে কিছু মানুষকে জরিমানা করার ব্যবস্থা ছাড়া আর গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা পালন করছে না। পরিবেশ আইনে সকল প্রকার সমস্যা সম্পর্কেই নির্দেশনা দেওয়া আছে কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করতে না পারলে আইন মূল্যহীন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিদ্যুৎ বিল বাঁচানোর জন্য কেউ ইটিপি বন্ধ রাখলো, একারণে পরিবেশ অধিদপ্তর তাকে নোটিশ করলে তিনি অধিদপ্তরে হাজিরা দিলেন এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর শুনানির পরে তাকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করল। এখন তিনি ফিরে যাওয়ার পরে আবার সেই কাজ জারি রাখলেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তদারকি করে তার কাছে আসতে আসতে চার থেকে পাঁচ বছর সময় লাগলো। এখন উনি ইটিপি বন্ধ রেখে এই এক লাখ টাকা বিদুৎ বিল দুই মাসেই উঠিয়ে ফেলতে পারবে। সুতরাং এক্ষেত্রে জরিমানা করে কিছুই হয় না। এখন এই প্রতিষ্ঠানকে মামলা করে যদি পুরোপুরি সীলগালা করে দেওয়া যেত, তবেই কেবল এই সমস্যা থেকে উত্তরণ পাওয়া যেত।”

পরিবেশ আদালতে মামলা করা হয়েছে প্রচুর কিন্তু এই ধরনের মামলায় কারও সাজা নিশ্চিতি ঘাটতি রয়েছে।দেশে দূষণকারীদের জেলে পাঠানোর মতো কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণেরনজির নেই।দূষণকারীদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো পরিদর্শক বা কর্মকর্তা পরিবেশ আদালতে মামলা করার পরে অভিযোগকারী কর্মকর্তাই হন সেই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এবং তার দায়িত্ব হচ্ছে সে নিয়মিত কোর্টে যাবে, তদন্ত করবে, সাক্ষ্য দিবে অর্থাৎ মামলাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিয়মিত কোর্টে যান না, অনেকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় না বা অনেকে সঠিকভাবে তদন্ত করতে পারে না। অথচ যদি তারা ঠিকভাবে সব করতে পারতো তবে যেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে দূষণকারী নদী দখল করে রেখেছে, ইটিপি বন্ধ করে রেখেছে তবে মামলার শেষে কারও না কারও সাজা অবশ্যই হতো। সুতরাং সাজা না হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে তদন্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলো ঠিকমতো অনুসরণে ঘাটতি।[৬৮]

---

[৬২] তথ্যদাতাএকজন অধ্যাপক, ০৬.০৭.২০২০।
[৬৩] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৯.০১.২০২০।
[৬৪] তথ্যদাতা,একজনঅধ্যাপক, , ০৬.০৭.২০২০।
[৬৫] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৯.০১.২০২০।
[৬৬]তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ১৪.০১.২০২০।
[৬৭] তথ্যদাতা, একজন প্রাক্তন সাংবাদিক ও পরিবেশবিদ, ২৯.০১.২০২০।
[৬৮] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ০৫.০২.২০২০।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কর্মসম্পাদনে সীমাবদ্ধতা

৪.১. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কর্মসম্পাদনে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৪.১.১. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৪.১.১.১. জনবল ঘাটতি

পরিবেশ অধিদপ্তরে জনবল সংকট রয়েছে। অধিদপ্তরে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১১৪১টি হলেও লোকবল আছে মাত্র ৪৬৫ জন অর্থাৎ শূন্য পদের হার ৫৯.২৫% । জনবল সংকটের কারণে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে একসাথে অনেকগুলো কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতে হয় ফলে কাজের মান কমে যায়। তাছাড়া অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যেমন ইআইএ রিপোর্ট পর্যালোচনা, ছাড়পত্র প্রদান, ইটিপি তদারকি, তদারকি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, মামলা দায়ের ও প্রতিবেদন জমা, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। লোকবলের অভাব থাকার কারণে সেবা প্রদানেদেরি হয় ও ঠিকমতো সেবা দেওয়া যায় না। যেমন,কোনো এলাকারশিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য যদি পরিদর্শক সরবরাহ করা হয় দুইজন করে কিন্তু ঐ এলাকাতে শিল্প কারখানা আছে একশতটি তাহলে দুইজন ঠিকমতো তদারকি করতে পারে না। পরিবেশ অধিদপ্তরে লোকবল দরকার হলেও এরা পর্যাপ্ত লোক নিয়োগ দেয় না।[৬৯]

লোকবলের অভাবের কারণে বড় বড় প্রকল্পের তদারকির কাজগুলো তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো হয়ে থাকে।পরিবেশ অধিদপ্তর শুধু শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ইটিপি ঠিকমতো পরিচালিত হচ্ছে কিনা সেগুলো সরাসরি তদারকিকরে। ছোট আকারের কাজ পরিবেশ অধিদপ্তর খুব সহজভাবে করতে পারলেও বড় বড় প্রকল্প যেগুলো দুইটা বা তিনটা উপজেলায় বাস্তবায়িত হয় সেগুলো তারা পরিচালনা করতে পারে না।তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ হয় সংশ্লিষ্ট ক্লায়েন্ট বা প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের দ্বারা। ফলে তাদের ইচ্ছার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।[৭০]

৪.১.১.২. বিশেষায়িত জ্ঞানের অভাব

প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অধিকাংশেরই পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ঘাটতি রয়েছে।[৭১]অভিযোগ রয়েছে কাজ ভালোভাবে বুঝে উঠার আগেই কর্মকর্তাদের বদলি হয়ে যায়। কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাহিদা যাচাই পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়াও তদারকি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করতে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব ক্ষেত্রভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দল নেই, এমনকি পরামর্শ নেওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্যানেলের (ক্ষেত্র ভিত্তিক আলাদা) বিশেষজ্ঞ তালিকা নেই।এছাড়া, প্রেষণে পদায়িত হওয়ার কারণে অধিদপ্তরের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সরকারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে (পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্প কারখানা স্থাপনে ছাড়পত্র প্রক্রিয়ায়) বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণেও ঘাটতি রয়েছে।

৪.১.২. ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিক্যাল

বাংলাদেশের সকল জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঘাটতি দেখা দিয়েছে।মাত্র ২১টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় আছে এবং কোনোকোনো কার্যালয়কে একইসাথে ৩-৪টি জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় বিধায় সকল ধরনের দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ও লজিস্টিক্যাল ঘাটতি রয়েছে, যেমন-মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে অত্যাবশ্যক অবকাঠামো (দাপ্তরিক কাজের জন্য কক্ষ ও বসার জায়গা) ও আসবাবপত্রের সংকট রয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয়

[৬৯]তথ্যদাতা, একজন পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা, ০২.০৩.২০২০।

[৭০] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৯.০১.২০২০।

[৭১] তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ০৬.০৭.২০২০।

লজিস্টিক্যাল সুবিধা, যেমন কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের ঘাটতি রয়েছেবলে সংশ্লিষ্ট তথ্য দাতা জানান।পরিবেশগত ছাড়পত্র আবেদন পদ্ধতি অনলাইনভিত্তিক করা হলেও প্রদান ও নবায়ন সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজড করা হয় নি।

৪.১.৩. আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ সংরক্ষণও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ তদারকি ও পরিবীক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হয় নি। পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালনার লক্ষ্যে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ও রিমোট সেনসিং-ভিত্তিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হয় নি। বিশ্বের অন্যান্য দেশে পরিবেশ দূষণের মাত্রা নির্ণয়ে আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হলেও অধিদপ্তর ম্যানুয়ালি পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করায় সঠিকভাবে দূষণের মাত্রা শনাক্ত করে তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তথ্যদাতাদের মতে, মাঠ পর্যায়ে সীমিত প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল দিয়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করায় প্রায়শ দূষণ বা পরিবেশগত বিপর্যয় তাৎক্ষণিকভাবে অধিদপ্তরের নজরে আসে না, কিংবা কর্মীদের একাংশ তা এড়িয়ে যায়।

৪.১.৪. আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ

৪.১.৪.১. পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বরাদ্দ

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও এতে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ অনুপস্থিত। জরিমানা, আর্থিক দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে যে অর্থ পাওয়া যায় সেটা পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো এবং দেশের পরিবেশের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হলেও নাকচ করে দেওয়া হয়।[৭২]

৪.১.৪.৩. জরিমানার অর্থ আদায়

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তর কর্তৃক জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্ত করা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জরিমানার অর্থ আদায় করা সম্ভব হয় না। কারণ দণ্ডপ্রাপ্ত অনেক প্রতিষ্ঠান পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে আপিল করে। নিষ্পত্তি শেষে তারা জরিমানার অর্ধেকেরও বেশি টাকা ফেরত পেয়ে যায়, এমনকি পুরো টাকা ফেরত পাওয়ারও নজির রয়েছে।[৭৩]তাছাড়া ভ্রাম্যমাণ আদালতে শুধু জরিমানা দিয়ে রেহাই নিয়ে আবারও পুরনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেহেতু মামলা হিসেবে এ আদালতের নথিগুলি সাময়িক সংরক্ষণ করা হচ্ছে, সে কারণে দ্বিতীয়বার অপরাধের বিচারের সময় প্রথমবারের অপরাধ উঠে আসে না। অথচ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং পরিবেশ আদালত আইন লজ্ঘনে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের অপরাধে প্রথমবারের চাইতে বেশি জরিমানার বিধান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মোবাইল কোর্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে যত সফলই হোক না কেন, পরিবেশ বিষয়ক আইন ভাঙার বিচারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছে না।[৭৪] পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের চেয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব সংগ্রহে আগ্রহ বেশি থাকায় তা পরিবেশ রক্ষায় অন্যতম অন্তরায় ও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। অপরদিকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন ফি আদায় অধিদপ্তরের অন্যতম আয়ের উৎস হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তারা এর আওতায় নিয়ে আসতে পারে নি।[৭৫]

---

[৭২] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১২.০২.২০২০।

[৭৩] জরিমানার অর্ধেক টাকাই ফেরত, কালের কণ্ঠ, বিস্তারিত দেখুনঃhttps://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2014/07/15/107048সর্বশেষ ভিজিটঃ ০৮.১২.২১।

[৭৪]পরিবেশের মরণবেশঃ আইনে সংকট প্রয়োগও তথৈবচ, বিডিনিউজ২৪.কম, বিস্তারিত দেখুনঃhttps://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/36323সর্বশেষ ভিজিটঃ ০৮.১২.২১।

[৭৫]পরিবেশের মরণবেশঃ আইনে সংকট প্রয়োগও তথৈবচ, বিডিনিউজ২৪.কম, বিস্তারিত দেখুনঃhttps://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/36323সর্বশেষ ভিজিটঃ ০৮.১২.২১।

৪.১.৪.৪.জোনভিত্তিক ভ্যাট ট্যাক্স জমা

এনবিআরের জোনভিত্তিক ভ্যাট ট্যাক্স জমা দেওয়ার বিধানের কারণে জরিমানা, ফি ইত্যাদি অর্থ জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে একজন তথ্যদাতা বলেন, "কর অফিসে যে কর্মকর্তারা কাজ করেন তাদের জন্য আনুমানিক ২৫% টাকা নির্ধারণ করা আছে, তারা ঐ টাকাটা প্রতিষ্ঠান সহকারী হিসেবে অফিসিয়ালি পাবে। কিন্তু এখানে আমরা সরকারের ভ্যাট কেটে দিচ্ছি, ভ্যাট আদায় করছি আমরা, এখন তারা মাসে মাসে হিসাব নিয়ে একটা পার্সেন্টেজ নিয়ে নিচ্ছে। তাছাড়া এদেরকে এলাকাভিত্তিক সেক্টর ভাগ করে দিয়েছে। কারণ যদি সম্পূর্ণ এনবিআরের টাকা এক জায়গায় জমা হয় তবে কেবলমাত্র ঐখানে যারা আছেন তারা পার্সেন্টেজ পাবেন, অন্যরা পাবেন না। তাই এলাকাভিত্তিক সেক্টর ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তারা আমাদের অনেক বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে। এখন আমরা ভ্যাটের টাকা যদি এক সেক্টরেরটা আরেক সেক্টরে জমা দেই তবে তারা আপত্তি তোলে যে এটা হবে না। এই জোনিংয়ের জন্য প্রক্রিয়াগুলো অনেক জটিল হয়ে গিয়েছে। যেমন এক কারখানার ছাড়পত্র হবে গাজীপুরে, এখন তার হেডঅফিস ঢাকায় হওয়ায় এখান থেকে আবেদন করে চালানের টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। এখন আমাদের গাজীপুরের অফিস ঢাকার কোড রেঞ্জের চালান জমা নিচ্ছে না। তারা বলছে এই চালানের ভ্যাট নিয়ে তারা ঝামেলায় পড়বে কারণ অফিসে চিঠি দিয়ে দিয়েছে যে রেঞ্জের বাহিরে ভ্যাট দেওয়া যাবে না, তারা মাসে মাসে এসে হিসাব নিয়ে যায়। হিসাব নেয় ঠিক আছে, কিন্তু আমরা তো সরাসরি ভ্যাট কেটে চালানে জমা দেই না, আমাদের বিল থেকে ভ্যাট যাচ্ছে। এই যে আমরা ছাড়পত্র ফি নিচ্ছি তার ১৫% ভ্যাট আমরা সরকারকে দিচ্ছি। কিন্তু এগিয়ে এসে লাভ নিচ্ছে এনবিআর।"[৭৬]

৪.১.৪.৫. 'পলুটারস পে প্রিন্সিপল' বাস্তবায়ন

'দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণপ্রদান' - এই মানদণ্ডের আলোকে জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ করার জন্য অধিদপ্তরের কাছে দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনো তালিকা নেই। ফলে 'পলুটারস পে প্রিন্সিপল' বাস্তবায়নে সংশয় দেখা দিয়েছে।

৪.২. স্বচ্ছতাজনিত চ্যালেঞ্জ

পরিবেশ অধিদপ্তরে তথ্যের উন্মুক্ততা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি বিদ্যমান। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর নিজস্ব কোনো ওয়েবসাইট নেই। সেখানে নাগরিক সনদ প্রদর্শিত না থাকায় অধিদপ্তরের স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা যায় না এবং তথ্য কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের মাধ্যম না থাকায় দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রদান করা যায় না।তাছাড়া অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় যে ওয়েবসাইটটি আছে সেটাতেওপূর্ণাঙ্গ বাজেট, জরিমানাকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও জরিমানার পরিমাণ এবং অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য অনুপস্থিত।প্রতিবছর বিভিন্ন পর্যায়ে কী পরিমাণ দূষণ হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে ও কারা করছে তা প্রকাশ করা হয় না। অধিদপ্তরে নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার কথা থাকলেও বিগত দুই বছরের প্রতিবেদন এখনো আপলোড না করায় সাধারণ জনগণতথ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না, এমনকি বিগত ছয় বছরেও পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্যচিত্র হালনাগাদ করা হয় নি। সেইসাথে দেশের বৃহৎ প্রকল্পসহ (যেমন রামপাল ওমাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র,পদ্মা সেতু ইত্যাদি) কোনো প্রকল্পেরই পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ(ইআইএ) প্রতিবেদনগুলোও ওয়েবসাইটে প্রকাশ হয় নি।

অভিযোগ রয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটি যথেষ্ট গোছানো না এবং ওয়েবসাইটের অনেক ভেতরে ঢুকে প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা পেতে হয়।[৭৭] একজন তথ্যদাতার মতে, "সঠিক তথ্য প্রাপ্তির ঘাটতির কারণে দালালদের দৌরাত্ম্য বিদ্যমান। কিছু সেবাগ্রহীতা আছে যারা অধিদপ্তরে না এসেদালালদের টাকা দেয় তাদের কাজ করে দেওয়ার জন্য। এসব দালাল আবার তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের কাছে আসে। দালালেরা উচ্চ পর্যায়ের কোনোকর্মকর্তা/কর্মচারীর কাছে যায় না বরং সে ধরে ড্রাইভারকে অথবা পিয়নকে। এখন পিয়ন বোঝে যে সে তো অফিসে যায় আসে, বেতন সরকার দেয় ঠিক আছে, এখন শুধু এই চিঠিটা রিসিভ করে যদি ক্লায়েন্টের হাতে দিয়ে এক

[৭৬] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা , ১২.০২.২০২০।

[৭৭] তথ্যদাতা, একজন পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা, ২৩.০২.২০২০।

হাজার টাকা পাওয়া যায় তো সমস্যাকিসের। অন্যদিকে সেই ক্লায়েন্ট মনে করে যে সে ছাড়পত্র রিসিভ করে যাচ্ছে কিন্তু এর পরে যে ঝামেলাগুলো আছে সে সম্পর্কে সেই ব্যক্তি পুরোপুরি অজ্ঞ থেকে যায়।"[৭৮]

বক্স-২:''কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবাদ সংগ্রহের সময় আমাদের মূলত হয়রানি ও আটকানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরে আমরা যে চ্যালেঞ্জটার মুখোমুখি সবচেয়ে বেশি হই তা হলো তথ্যের গোপনীয়তা। অধিদপ্তরের কাছে সকল তথ্য ও প্রতিবেদন যেমন, কোনো ইন্ডাস্ট্রি কী মাত্রায় দূষণ সৃষ্টি করছে বা কেন এবং কত পরিমানে জরিমানা করা হয়েছে ইত্যাদি থাকলেও দেখতে বা পেতে চাইলে সেটা তারা দেখায় না বা দেয় না। তারা তথ্য দিতে সময়ক্ষেপণ করেন, আবার অনেক সময় তথ্য গোপনীয় জানিয়ে সেটা দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।"
(সূত্রঃ একজন পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিকের মন্তব্য)

৪.৩. জবাবদিহির ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ

৪.৩.১. কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণে ঘাটতি

- **অনিয়মিত তদারকি ও সময়ক্ষেপণ:**পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে তদারকির সময় ইটিপি, কারখানার পরিবেশ, পানির মান, লাইসেন্সের কাগজপত্র, ল্যাবরেটরি রিপোর্ট, টাকার রশিদ, ছাড়পত্র নবায়ন ও মূল সার্টিফিকেট ইত্যাদি বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে দেখতে হয়।[৭৯]পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড তদারকি ও পরিবীক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ না হওয়ায় তদারকি ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিল্পকারখানাগুলো পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা দ্বারা নিয়মিত তদারকি করা হয় না।[৮০]পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল অফিসের কর্মকর্তারাএকরকম না। কেউ সংশ্লিষ্ট কারখানার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সঠিকভাবে তদারকি করে না, বিপরীতে অনেক সৎ পরিচালক আছেন যাদের উপর কোনো প্রকার প্রভাব কাজ করে না।[৮১]অভিযোগ রয়েছে পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে তদারকি করা হয় না বরং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজস্ব লাভের জন্য তদারকিকরা হয়ে থাকে।[৮২] এমনকিতদারকি ও পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগ আমলে নেওয়ার উদাহরণ বিরল। তাছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন ছাড়পত্র হস্তান্তর করতেও সময়ক্ষেপণ করা হয়।[৮৩] টিআইবির জরিপের আওতাভুক্ত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিল্পকারখানায় বছরে একবারও পরিবেশ অধিদপ্তরের তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি।

[৭৮] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭.০২.২০২০।
[৭৯]তথ্যদাতা, একজন পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা, ০২.০৩.২০২০।
[৮০]তথ্যদাতা, একজন পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা, ২৩.০২.২০২০।
[৮১] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ০৫.০২.২০২০।
[৮২]তথ্যদাতা, একজন পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা, ২৩.০২.২০২০।
[৮৩]তথ্যদাতা, একজন পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা, ২৩.০২.২০২০।

চিত্র-২: পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে শিল্পকারখানা বাৎসরিক তদারকি
(পরিদর্শনকৃত কারখানার শতকরা হার)

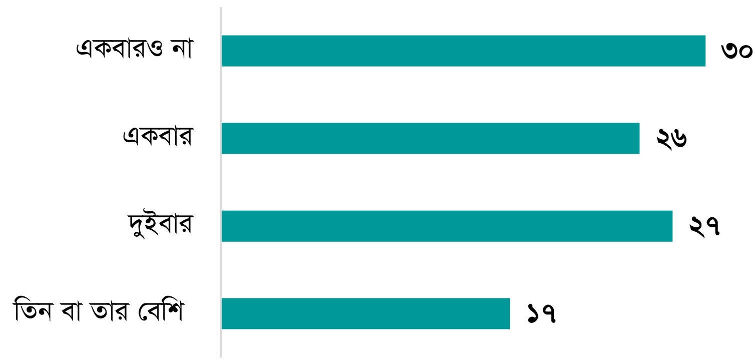

- **দালালের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধে অক্ষমতা:** পরিবেশগত ছাড়পত্র নেওয়ার ক্ষেত্রে দালালের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করতে যেয়ে হয়রানির শিকার হতে হয় সেবাগ্রহীতাদের। বিশেষকরে, পরিবেশগত ছাড়পত্র নেওয়ার জন্য গ্রাম থেকে যারা আসেন তারা এই পুরো নিয়মনীতি ও প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে জানেন না, তাই তারা এই কাজটি দালালের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে চান এবং ফলস্বরূপ হয়রানির শিকার হন। বর্তমানে সরকার ছাড়পত্রের আবেদনগুলো অনলাইনের মাধ্যমে জমা নিচ্ছে। এতে দালালদের দৌরাত্ম্য কিছুটা কমলেও পুরোপুরি উৎপাটন করা যায় নি।[৮৪]
- **ইআইএ প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ না করা:**ইআইএ প্রতিবেদনে পরিবেশের মানমাত্রাগুলো ঠিকমতো আছে কিনা এবং বাস্তব রূপকে প্রতিফলিত করছে কিনা সেটা খতিয়ে না দেখাসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তদারকি প্রতিবেদনে প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কাগজে কলমে ও বাস্তবে আমাদের পরিবেশের অবস্থার মাঝে বিরাট তফাৎ আছে। বিভিন্ন কোম্পানির জমা দেওয়া প্রতিবেদনে পরিবেশের মানমাত্রাগুলো ঠিকমতো আছে কিনা সেটা অন্য কেউ যে মূল্যায়ন করবে সেই ব্যবস্থা নেই। কাগজে কলমে প্রতিবেদন থাকলেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের হলেও যাচাই করে দেখা হয় না।[৮৫]
- **বিশেষজ্ঞদের দ্বারা খসড়া ও তদারকি প্রতিবেদন পর্যালোচনা না করা:**প্রকল্পের ইআইএ সম্পন্নের পর তদারকি প্রতিবেদন যথাযথভাবে দাখিল করা হয় না এবং খসড়া প্রতিবেদন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয় না। পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভুল ত্রুটিগুলো বোঝা ও ধরার মতো সামর্থ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের নেই বলে অভিযোগ রয়েছে। একজন তথ্যদাতার মতে, "বাংলাদেশে যে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে তার প্রভাব তদারকি করার জন্য আণবিক শক্তি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা অধিদপ্তরের নেই। এমনকি পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির কোনো প্রচেষ্টাও তাদের মধ্যে দেখা যায় না। ছোট প্রকল্পগুলো এমনকি অনেক বড় বড় প্রকল্পগুলোতেও তদারকি প্রতিবেদন ঠিকমতো দাখিল করা হয় না। তদারকি প্রতিবেদন জমা দেওয়া হলেও সেটা ত্রুটিপূর্ণ কারণ এই প্রতিবেদনগুলো বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয় না।"তাছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব ক্ষেত্রভিত্তিক আলাদা বিশেষজ্ঞ দল নেই।ঢাকার আশেপাশে প্রায় ৩০টিবিশ্ববিদ্যালেসংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞথাকলেও তাদের যোগ্যতা এবং প্রতিবেদন পর্যলোচনায় পারঙ্গমব্যক্তিদের তথ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে নেই।[৮৬]
- **মোবাইল কোর্টে জরিমানা করার পরেও তা মওকুফ করে দেওয়া:** পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টিমআইন অনুযায়ী জরিমানা ধার্য করে। ধার্যকৃত জরিমানার বিরুদ্ধে পরিবেশ আইনে আপিলের সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ নিয়ে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই আপিল করে। অধিদপ্তরের ধার্য করা জরিমানার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় এবং আপিল আবেদনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের জরিমানার টাকা মওকূফ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে কী কারণে জরিমানা মওকূফ করেদেওয়া হয় তা এনফোর্সমেন্ট টিমের কাছে ব্যাখ্যা করা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে করে এনফোর্সমেন্ট টিমের

[৮৪] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭.০২.২০২০।
[৮৫]তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ২১.০১.২০২০।
[৮৬]তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ১৪.০১.২০২০।

কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একজন তথ্যদাতা এর কারণ হিসেবে বলেন, "বেশিরভাগ সময়ই জরিমানা মওকুফ করার পেছনে কারণ হিসেবে বলা হয় যে কারখানাগুলোকে বেশি টাকা জরিমানা করলে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন দিতে গড়িমসি করে। আর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই রপ্তানির সঙ্গে জড়িত। তারা বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স আনছে। সে কাজও যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়টি আপিল নিষ্পত্তির সময় লক্ষ্য রাখা হয়।"[৮৭]

৪.৩.২.সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদারকির ঘাটতি

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড যথাযথ তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতি রয়েছে বলে তথ্য দাতারা জানান। সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারক ও উর্ধ্বতনকর্মকর্তাদের একাংশের সাথে বিধি-বহির্ভূত লেনদেন ও স্বার্থের সংঘাত থাকায় জবাবদিহিতা ব্যবস্থা ক্ষেত্র বিশেষে অকার্যকর।

৪.৩.৩. গতানুগতিক নিরীক্ষা প্রক্রিয়া

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় কর্তৃক অধিদপ্তরের ওপর গতানুগতিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।এক্ষেত্রে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে মাঠ কার্যালয় পর্যন্ত নথি পর্যালোচনা-ভিত্তিক নিরীক্ষা হয়, মাঠ জরিপ-ভিত্তিক নয় (বক্স ২)।সিএজি'র পর্যবেক্ষণ আমলে নিয়ে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের দৃষ্টান্ত বিরল। 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯' মোতাবেক সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া বা প্রকাশ করা হয় না। এ ব্যাপারে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা যায় নি।

বক্স-৩: "পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষায়িত ও আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা করার জন্য কারিগরি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান জরুরি হলেও যারা নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন তাদের এই সংক্রান্ত জ্ঞান নেই। দূষণ নিয়ন্ত্রণে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে; দূষণের হার কত; জরিমানা, আর্থিক দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণের পরিমাণ ও দূষণকারী, ইত্যাদি বিষয়ের পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে থাকে না। ২০০৭ সালে প্রণীত 'এনভায়রনমেন্ট পারফরমেন্স অডিট' এ পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্পে একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডসম্পন্ন জনবল নিয়োগ না দেওয়ার পর্যক্ষেণ উঠে এসেছিলো। তাই, নিয়মিত ও বাধ্যতামূলকভাবে 'এনভায়রনমেন্ট পারফরমেন্স অডিট' সম্পন্ন করা উচিত।"

(সূত্র: একজন মুখ্য তথ্যদাতার মন্তব্য)

৪.৩.৪. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় ঘাটতি

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) নামক অ্যাপসের মাধ্যমে এবং ইমেইলের মাধ্যমে সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ করা হলেও অভিযোগকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রসহ বিস্তারিত ঠিকানা নেওয়ায় এবং অভিযোগকারীর সুরক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপ না থাকায় সাধারণ জনগণের অনীহা লক্ষণীয়।পরিবেশ অধিদপ্তরের বিবিধ কার্যক্রমে অনিয়ম থাকলেও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় আস্থাহীনতা রয়েছে এবং অভিযোগ প্রদানেও অনীহা রয়েছে। যেমন- লিখিত অভিযোগ গ্রহণের জন্য কার্যালয়গুলোতে কোন অভিযোগ বাক্স নেই; ক্ষেত্রবিশেষে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগ তদন্তে ঘাটতি রয়েছে এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে তদন্ত ও সুরাহা করায় ঘাটতি রয়েছে। সাধারণ জনগণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অধিদপ্তর থেকে কারণ দর্শনোর নোটিশ পাঠানো হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই প্রতিষ্ঠানের মুচলেকা নিয়ে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করা হলে প্রশাসনিকভাবে তদন্তের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। আন্তঃবিভাগীয় কোনো অভিযোগ দাখিল হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হয় বলা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে অভিযোগকারী কর্মীর হয়রানির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবিদ্যমান।

[৮৭] জরিমানার অর্ধেক টাকাই ফেরত, কালের কণ্ঠ, বিস্তারিত দেখুন:https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2014/07/15/107048সর্বশেষ ভিজিট: ০৯.১২.২০২১।

২.৪. জনঅংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ঘাটতি

সদর দপ্তরে প্রতি মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার গনশুনানি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বলা হলেও তার কার্যকরতায় ঘাটতি রয়েছে। গনশুনানিতে দাখিল করাঅভিযোগ নিস্পত্তি না হলে পুনরায় লিখিত অভিযোগ দিতে হয়।যেকোনো প্রকল্প শুরু করার পূর্বে এবং পরিবেশগত সমীক্ষা (আইইই, ইআইএ এবং এসআইএ) পরিচালনার সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। ফলে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ করার কথা থাকলেও তা নিশ্চিতে ঘাটতি থাকায় পরিবেশের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে ঘাটতি থেকে যায়। আবারক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবেশগত বিপন্নতা ও পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মতামত পরিবেশগত সমীক্ষাতে (আইইই, ইআইএ এবং এসআইএ) প্রতিফলিত হয় না।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া অংশীজনদের পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করতে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। একজন তথ্যদাতার মতে, "পরিবেশ আইনে জনঅংশগ্রহনের ব্যাপারে স্পষ্ট কোনোনির্দেশনা নেই। শুধুমাত্র স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে একটা অনাপত্তিপত্র নিতে হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের স্থানীয় পর্যায়ে কোনোজনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নেই। স্থানীয় পর্যায়ে তাদের কোনো সংস্থা নেই ফলে প্রচারণামূলক কোনো কার্যক্রম তারা করতে পারছে না। জনগনকে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট কাজে সম্পৃক্ত করা ও জনগনকে দিয়ে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা করানোর কোনো পরিকল্পনাও অধিদপ্তরের নেই। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যেমন- চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সেক্ষেত্রে যথেষ্ট শিক্ষিত না হলেও তারা তাদের স্থানীয় জ্ঞান ও কেন্দ্রের নেতৃত্বে প্রকল্পগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে, তো এই ধরনের কাজ তারা পরিবেশের জন্যও করতে পারে।"[৮৮]

আরেকজন তথ্যদাতার মতে, "ঢাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তারপরেও কার্যকর কোনো ফলাফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এই বিফলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে সাধারণ জনতাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে অর্থাৎ যাদের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাদের কখনো আলোচনায় ডাকা হয় নি, তাদের সাথে কোনো রকম জনসংযোগ করে নি। ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সাধারণ জনগণের কোনো মাথাব্যাথাও নেই। তাইজনঅংশগ্রহণ ছাড়া পরিবেশেরকোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়।" [৮৯,৯০]

৪.৫. কার্যসম্পাদনের চ্যালেঞ্জসমূহ

৪.৫.১.ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ চিহ্নিতকরণ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা

- **নমুনা সংগ্রহে চ্যালেঞ্জঃ** ইটিপি থেকে নির্গত পানির মান সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয় না। ইটিপি থেকে নির্গত পানির মান যাচাইয়ে টোটাল ডিসলভড সলিডের পরিমাণ নির্ণয় জরুরী হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর শুধুমাত্র ডিসলভড অক্সিজেন (ডিও), বায়োলজিকাল অক্সিজেন ডিমান্ড (বিওডি), কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (সিওডি) এবং সম্প্রতি টোটাল সাস্পেণ্ডেড সলিডের (টিএসএস)পরিমাণ পরীক্ষা করছে। তছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকার কারণে সঠিকভাবে মান নির্ণয় ব্যহত হচ্ছে।[৯১]এমনকি নমুনা সংগ্রহে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কম সময় নিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে প্রতিবেদন দাখিল করায় প্রত্যাশিত মানের ইফ্লুয়েন্ট ডিসচার্জ না হলেও সেই ঝুঁকিপূণ প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না।[৯২]
- **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জঃ** প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে মানব বসতিসহ সম্পুর্ণ এলাকাকে ইসিএ হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং মাল্টিপল জোনিংয়ের মাধ্যমে এলাকাগুলোকে ভাগ করে আলাদা করার কথা থাকলেও সেটা না করে ঐসব এলাকার সমস্ত অবকাঠামো নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। যেমন, কক্সবাজার শহরে

[৮৮]তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ১৪.০১.২০২০।
[৮৯] তথ্যদাতা, একজন পরিবেশবিদ ও প্রাক্তন সাংবাদিক, ২৯.০১.২০২০।
[৯০] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ০৫.০২.২০২০।
[৯১]তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ৩১.১২.২০১৯।
[৯২]তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ২১.০১.২০২০।

সৈকতের তীরেজনবসতিসহ সমস্ত ঘড়বাড়ি ভেঙ্গে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইসিএ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কক্সবাজারের বীচে যে জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র আছে সেগুলোকে রক্ষা করা। কিন্তু শহরের ভিতর বা টুরিস্ট জোনে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।[৯৩]

- **ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প ও শিল্প কারখানা চালু রাখা:** পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার পরে 'মিটিগেশন মেজার' পরিকল্পনা দিয়েও কোনো প্রকল্পের ঝুঁকি নিরসন না করার সম্ভাবনা থাকলে তা বাতিল করার নিয়ম রয়েছে কিন্তু সরকারি বড় প্রকল্প এবং বড় বিনিয়োগের শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রয়োগ হয় না ।[৯৪]
- **স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশগত প্রভাবগুলো বিবেচনা না করা:** সরকারি প্রকল্পের নকশা করার সময় জলবায়ুর উপাদানসমূহের প্রভাব 'ম্যাক্রো পারস্পেক্টিভে' বিবেচনা করা হলেও স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাবগুলো বিবেচনা করা হয় না।একজন তথ্যদাতার মতে, "সারাদেশে ৩৬ থেকে ৪৬টি আবহাওয়া স্টেশন আছে। এখন কেউ যদি সুনামগঞ্জের পরিবেশগত প্রভাব যাচাই করে দেখতে চায় তবে তারশ্রীমঙ্গল বা সিলেটের তথ্য ব্যবহার করতে হবে কারণ সুনামগঞ্জে কোনো আবহাওয়া স্টেশন নেই। কিন্তু সুনামগঞ্জের সাথে আবার এদের আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য সাদৃশ্যপূর্ণ নয় বরং অনেকটা উল্টো। কারণ সুনামগঞ্জের উপরেই চেরাপুঞ্জি অবস্থিত এবং সেখানে গড়ে নয় হাজার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হচ্ছে কিন্তু আমাদের ঐ দুই স্টেশনে রেকর্ড হচ্ছে চার হাজার মিলিমিটার। সুতরাং বাস্তব চিত্র এখানে প্রতিফলিত হচ্ছে না এবং এর ভিত্তিতে যদি ইআইএ করা হয় তবে সেটা ত্রুটিপূর্ণ হবে।"[৯৫]
- **ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন কতিপয় সাধারণ ফরমেট অনুসরণ পূর্বক কপিপেস্ট করে জমা দিলেও অধিদপ্তরের এ সংক্রান্ত নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। ফলে পরিবেশের প্রকৃতঅবস্থা রিপোর্টগুলোতে উঠে না আসায় ঝুঁকি চিহ্নিত করা যায় না।[৯৬]

৪.৫.২.দখলকৃত প্রাকৃতিক ও নাগরিক সম্পদ পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণ

পরিবেশ সুরক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলেও তা পালনে সুস্পষ্ট ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির সুনির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে-

- **কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প:** প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার কাছে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ ভারী শিল্প কারখানা স্থাপন অব্যাহত রয়েছে। রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ৪ কিঃমিঃ দূরে সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এবং ২.৫ কিঃমিঃ দূরে বিপন্ন প্রজাতির ইরাবতী ডলফিনের অভয়ারণ্যের ক্ষতি রোধে পরিবেশ অধিদপ্তর কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। ইউনেসকোর পর্যবেক্ষণ ও রামসার কনভেনশন মোতাবেক রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটির পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন ত্রুটিপূর্ণ ও সুন্দরবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত হয়। কিন্তু দফায় দফায় ইআইএ প্রতিবেদন পরিবর্তন করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর প্রথমে আপত্তি জানালেও সরকারের চাপে প্রকল্পটির বিরুদ্ধে অনড় অবস্থান গ্রহণ করে নি। পরিবেশবাদীদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রকল্পটির বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।[৯৭]
- **বায়ু দূষণ:** বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে দূষিত রাজধানীর তালিকায় ঢাকার অবস্থান শীর্ষ পর্যায়ে হলেও দূষণ বন্ধে অধিদপ্তর সুরক্ষামূলক কার্যকর ব্যবস্থা (বৌজার, স্ট্রিট স্প্রিংক্লার সংগ্রহ) গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।[৯৮]
- **জনস্বাস্থ্য:** রাজধানীসহ বড় বড় নগরগুলোতে খাওয়ার পানির লাইন ও সুয়ারেজ লাইন পাশাপাশি থাকায় পাইপ লিকেজ হয়ে অনেক সময় পানি দূষণের শিকার হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না।[৯৯, ১০০]

---

[৯৩]তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ১৪.০১.২০২০।

[৯৪] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৯.০১.২০২০।

[৯৫]তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ২৯.০১.২০২০।

[৯৬]তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ১৪.০১.২০২০।

[৯৭]UNESCO to Bangladesh: Cancel Rampal coal plant, or Sundarbans could be added to List of World Heritage in Danger in 2017, Endcoal.org, সর্বশেষ ভিজিট- ০৯.১২.২০২১,বিস্তারিত দেখুন- https://endcoal.org/2016/10/unesco-to-bangladesh-cancel-rampal-coal-plant-or-sundarbans-could-be-added-to-list-of-world-heritage-in-danger-in-2017/

[৯৮]তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ২১.০১.২০২০।

[৯৯] প্রাগুক্ত, ২১.০১.২০২০।

[১০০]তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ২১.০১.২০২০।

- **নদী দূষণ রোধঃ** নদী দূষণ রোধে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (সিটি কর্পোরেশন) সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে।

৪.৫.৩. মেয়াদোত্তীর্ণ পরিবেশগত ছাড়পত্র

জরিপকৃত শিল্প কারখানার শতকরা ৫১ ভাগ মেয়াদোত্তীর্ণ ছাড়পত্র দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার শতকরা ৭০ ভাগ তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত নবায়নের জন্য আবেদনই করেনি।

চিত্র ৩: মেয়াদোত্তীর্ণ পরিবেশগত ছাড়পত্র নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা (শিল্প কারখানার শতকরা হার)

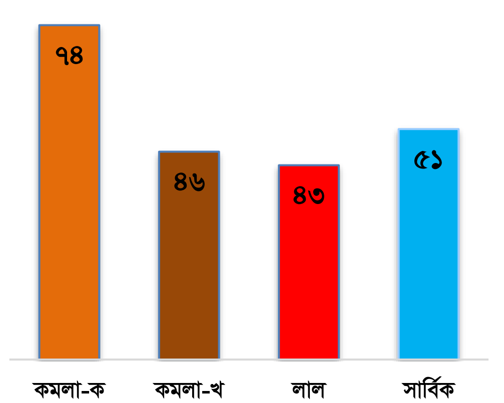

চিত্র ৪: তথ্য সংগ্রহের সময় ছাড়পত্র নবায়নের অবস্থা (শিল্প কারখানার শতকরা হার)

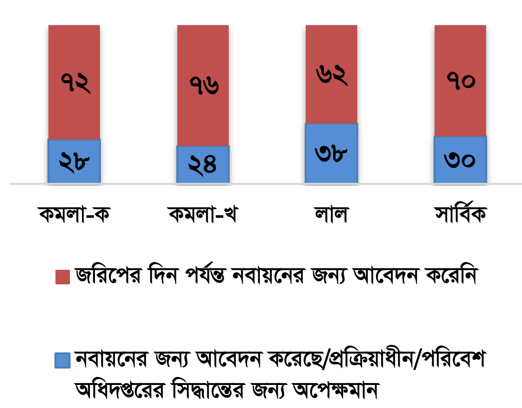

৪.৫.৪. ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও আদায়

দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে ঘাটতি: 'দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান' মানদণ্ডের আলোকে জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণে ঘাটতির অন্যতম কারণ হচ্ছে নিয়মিত জরিপের মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন তালিকা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে মাত্র ৭০ কোটি ৭৭ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে যা গত ৪ বছরে বাংলাদেশে দূষণের কারণে যে পরিমান পরিবেশগত বিপর্যয় হয়েছে তার তুলনায় নগন্য। এছাড়া, কার্বন ট্যাক্স, গ্রীন ট্যাক্স ও পরিবেশ ট্যাক্স এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এখনো বিশদভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরা হয় নি। সেইসাথে আইনের মাধ্যমে এইধরণের ট্যাক্স পরিশোধের কোন বাধ্যবাধকতা রাখা হয় নি।

নির্ধারিত জরিমানা আদায়ে ঘাটতি: পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার কোনরুপ ক্ষতি সাধন করলে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টীম যেকোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের অধীনে জরিমানা ও দন্ড আরোপ করতে পারেন। জরিমানা আদায়ের পর স্বাভাবিকভাবেই দোষী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রায়ের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আবেদন করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আদালতে অর্ধেক এমনকি পুরো অর্থ ফেরত পাওয়ার নজির রয়েছে। জরিমানা মওকুফের এই রীতি অধিদপ্তরের জরিমানা নির্ধারণের পুরো প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, সেইসাথে এর পেছনে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে ।[১০১, ১০২]

---

[১০১] জরিমানার অর্ধেক টাকাই ফেরত, কালের কণ্ঠ, সর্বশেষ ভিজিট- ০৮.১২.২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2014/07/15/107048
[১০২] পরিবেশদূষণের জরিমানা লোক দেখানো, প্রথম আলো,সর্বশেষ ভিজিট- ০৮.১২.২০২১।

গবেষণা বরাদ্দে ঘাটতি: সমন্বয় না থাকায় পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত অনেক গবেষণা প্রকল্পে যথাযথ বরাদ্দ না দেওয়ার ফলে পরিবেশ সংরক্ষণে গবেষণালব্ধ তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত গবেষণার অনেক সফল প্রকল্প রয়েছে যেগুলোর জন্যঅর্থায়ন না থাকার কারণে বন্ধ রয়েছে। অনেক ভালো গবেষণা রয়েছে যেগুলো সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা নেই।[১০৩]

আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ পরিবেশ সুরক্ষায় ব্যবহার না করা: জরিমানা, আর্থিক দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে যে অর্থ পাওয়া যায় তা থেকে কিছু অংশ প্রণোদনাস্বরূপ পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হলেও তা মন্ত্রণালয় নাকচ করে দেয়। জরিমানা, আর্থিক দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে যে অর্থ পাওয়া যায় সেটা সরকারি তহবিলে জমা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ হওয়ায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এই অর্থ থেকে কিছু অংশ প্রণোদনাস্বরূপ পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং দেশের পরিবেশের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করার প্রস্তাবনা করেছিল কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাবটি নাকচ করে দেয়।[১০৪] সম্প্রতি জরিমানার এই অর্থ ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের নিমিত্তে ব্যয় করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সুপারিশ করেছে।[১০৫]

৪.৫.৫. মামলা পরিচালনা

পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) মোতাবেক দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পাশাপাশি নিয়মিত পরিবেশ আদালত বা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে শিল্প বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ, পাহাড় কর্তন ও জলাধার ভরাট করার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করায় পরিবেশ আদালতে ১৯টি ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৫৯টিসহ সর্বমোট ৭৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হাইকোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তর বা সরকারের বিরুদ্ধে রিটমামলা দায়ের করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মহামান্য আদালত কিছু কার্যক্রম গ্রহণে পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এ ধরনের কার্যক্রমের গত ৩ অর্থ বছরের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো।

সারণি-৮: পরিবেশ অধিদপ্তর/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিটিশনের পরিসংখ্যান

বছর	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
২০১৮-১৯	১৬৫	১৩৯
২০১৯-২০	১৭২	২১৫
২০২০-২১	৮৬	৫৫

তথ্যসূত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর।

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১টি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২টি ও ২০২০- ২১ অর্থ বছরে ৫টি কন্টেম্পন্ট রুল ইস্যু করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রুলের জবাব দেওয়া হয়েছে। কোনটিই

[১০৩]তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ৩১.১২.২০১৯।

[১০৪] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১২.০২.২০২০।

[১০৫] পরিবেশ দূষণে জরিমানার টাকা ক্ষতিগ্রস্তদের দেওয়ার সুপারিশ, জাগো নিউজ, সর্বশেষ ভিজিট- ০৮.১২.২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jagonews24.com/national/news/708543

চূড়ান্তভাবে কন্টেম্পন্ট হয়নি। এছাড়া সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে বিপরীতে নিস্পত্তিকৃত মামলার যে সংখ্যা দেখানো হয়েছে তার মধ্যে ঐ অর্থ বছরসহ পূর্বে দায়েরকৃত রিট মামলা রয়েছে।

পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের অনীহা লক্ষ্য করা যায়।পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণকারীদের বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে মামলা করার পরিবর্তে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে জরিমানা নির্ধারণে বেশি আগ্রহী বলে অভিযোগ রয়েছে। দূষণকারীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ এর অধীনে করা মামলার সংখ্যা মাত্র ৩৮৮টি (২০১৫-২০২০) যেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মামলার সংখ্যা ৮ হাজার ৭৫৬টি।

এছাড়াও অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ আদালতে মামলার তদন্ত প্রতিবেদন সময়মতো দাখিল ও সাক্ষী হাজির করায় ঘাটতি রয়েছে ফলে খুব সহজেই দূষণকারীরা ছাড় পেয়ে যাচ্ছে এবং ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বিচারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দূষনকারীদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন পরিদর্শক বা কর্মকর্তা পরিবেশ আদালতে মামলা করার পরে অভিযোগকারী কর্মকর্তা হন সেই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এবং তার দায়িত্ব হচ্ছে নিয়মিত কোর্টে যাওয়া, তদন্ত করা, সাক্ষ্য দেওয়া অর্থাৎ মামলাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তারা নিয়মিত কোর্টে যান না, অনেকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় না বা অনেকে সঠিকভাবে তদন্ত করতে পারে না।মামলা নিস্পত্তিতে বিলম্ব হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনজীবী নিয়োগ না করা। এছাড়া নির্দিষ্ট আইনজীবীদের অধিক উপার্জনের পথ সুগম রাখতে মামলা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনজীবী নিয়োগ না করার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, সাজা না হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে তদন্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে কোন ফাঁক রেখেছেন যার কারণে যথাযথ সাজা হচ্ছে না।[১০৬]

৪.৬. পরিবেশ রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়

- **ইএমপি বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি:** বিভিন্ন প্রকল্প ও শিল্প কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাতে (ইএমপি) উল্লেখকৃত নির্দেশনাবলীর যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকির দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের হলেও সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে তা পরিবেশ অধিদপ্তরের দ্বারা পর্যবেক্ষন করা সম্ভব না কারণ বর্তমানে অগণিত প্রকল্প চালু আছে। স্পর্শকাতর প্রকল্পে যেমন- ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে ইফ্লুয়েন্ট তৈরির বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সরাসরি তদারকি করার কথা থাকলেও সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে কতক্ষন ইটিপি চলে, কী পরিমাণ ইফ্লুয়েন্ট তৈরি করছে, ক্রাইটেরিয়া ও গাইডলাইন অনুযায়ী কতটুকু ডিসচার্জ করছে এসংক্রান্ত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রনয়ণ করতে ব্যর্থতা রয়েছে।[১০৭]
- **মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা:**পরিবেশ অধিদপ্তরের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা। ফলে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে মেজেস্ট্রিসী বা পুলিশী ক্ষমতার জন্য অধিদপ্তরকে অন্য দপ্তরের উপর নির্ভর করতে হয়। মূলত তিনটা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের অভাবেই অধিদপ্তরের আইন প্রয়োগ ঠিকমতো হচ্ছে না। কারণ পুলিশকে দায়িত্ব দিলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে, জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব দিলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।[১০৮]
- **আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় ঘাটতি:** আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেসি বা পুলিশি ক্ষমতার জন্য অধিদপ্তরকে অন্য দপ্তরের উপর নির্ভর করতে হয়। এখানে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় পরিবেশ আইনের প্রয়োগ যথাযথভাবে হয় না।দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে সময় ও সুযোগমতো প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায় না।[১০৯]
- **বিদ্যমান কমিটিগুলোর অকার্যকরতা:**পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধনের জন্য বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে সম্প্রতি গঠিত সমন্বয়ক কমিটিতে সরকারি অন্যান্য সংস্থাগুলোর (ওয়াসা, রাজউক, সিটি কর্পোরেশন) প্রতিনিধিরা থাকলেও কোনো কার্যকর উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে না। যেমন: সম্প্রতি পরিবেশ অধিদপ্তর বায়ু দূষণ কমানোর জন্য ৩১টি প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দেশনা তৈরি করেছে। এই নির্দেশনা জানিয়ে ঐ ৩১টি প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দেওয়া হয়েছে যেমন: রাস্তা খোড়াখুড়ির কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে, রাস্তার কাজ, কোনোসরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজ অথবা কারো

[১০৬] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ০৫.০২.২০২০।
[১০৭] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৯.০১.২০২০।
[১০৮] তথ্যদাতা, একজন পরিবেশবিদ ও প্রাক্তন সাংবাদিক, ২৯.০১.২০২০।
[১০৯] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ০৫.০২.২০২০।

ব্যক্তিগত কাজের স্থানে বা রাস্তার পাশে বালি বা সিমেন্ট ফেলে রাখা হয়েছে কিনা সেটা দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। এই নির্দেশনা একেবারে স্পষ্ট কিন্তু এটা কতটা বাস্তবায়ন হচ্ছে সেটা বাস্তব চিত্র ঘটলেই দেখা যায়।[১১০]

- **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা:** পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য সকল ক্যাটাগরির শিল্প কারখানার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে অনাপত্তিপত্র জমা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু জরিপের আওতাভূক্ত শতকরা ১৭ ভাগ শিল্প কারখানা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনাপত্তিপত্র না পাওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

চিত্র-৫: স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র পাপ্তি (শিল্প কারখানার শতকরা হার)

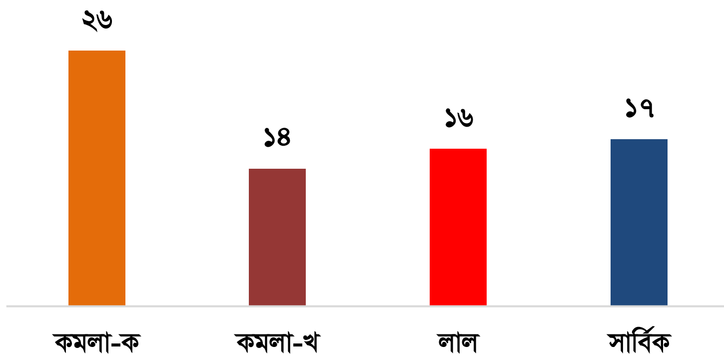

পঞ্চম অধ্যায়: পরিবেশ অধিদপ্তর ও পরিবেশকেন্দ্রিক দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা

বর্তমান গবেষণায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরে শুদ্ধাচার চর্চায় বিচ্যুতির ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রার ওপর তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে গবেষণায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য কেইস স্টাডিসহ উপস্থাপনা করা হয়েছে।

৫.১. আইনের প্রয়োগ

- **সংকটাপন্ন ও সংরক্ষিত এলাকাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানও অবকাঠামো নির্মাণ:** পরিবেশ অধিদপ্তরের আইন প্রয়োগে দুর্বলতার কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠান লোকালয় ও সংরক্ষিত এলাকাতে গড়ে উঠছে। এমনকি সরকারী প্রতিষ্ঠানও বিদ্যমান আইনের তোয়াক্কা না করে এসকল এলাকায় একের পর এক প্রকল্প ও স্থাপনা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে।[১১১]

---

[১১০] প্রাগুক্ত, ০৫.০২.২০২০।

[১১১] ৭০০ একর সংরক্ষিত বনভূমি প্রশাসন একাডেমির জন্য বরাদ্দে উদ্বেগ, সারাবাংলা, সর্বশেষ ভিজিট- ০৯.১২.২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://sarabangla.net/post/sb-595923/

■ **ক্ষতিকর প্রকল্প চালু রাখা:**লাল শ্রেণির প্রকল্প বা শিল্পের ক্ষেত্রে ইআইএ'র আগেই অবস্থানগত ছাড়পত্র নিতে হয়; ফলে অবস্থানগত ছাড়পত্র পাওয়ার পর অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হওয়ায় এবং ইতোমধ্যে যেহেতু ভূমিরূপের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তাই ইআইএ রিপোর্ট নেতিবাচক এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হলেও 'মিটিগেশন মেজার' দিয়ে প্রকল্প চালু রাখা হয়।[১১২]

আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন: আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন না করার আইনী বিধান থাকলেও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদানঅব্যাহত রয়েছে। টিআইবি পরিচালিত জরিপের আওতাভূক্ত বেশিরভাগ শিল্প কারখানাই (প্রায় এক-চতুর্থাংশ) আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। এইসব শিল্প কারখানার শতকরা ৩১ ভাগ বায়ু নির্গমন এবং ৩৯ ভাগ শব্দ নির্গমন করে ।

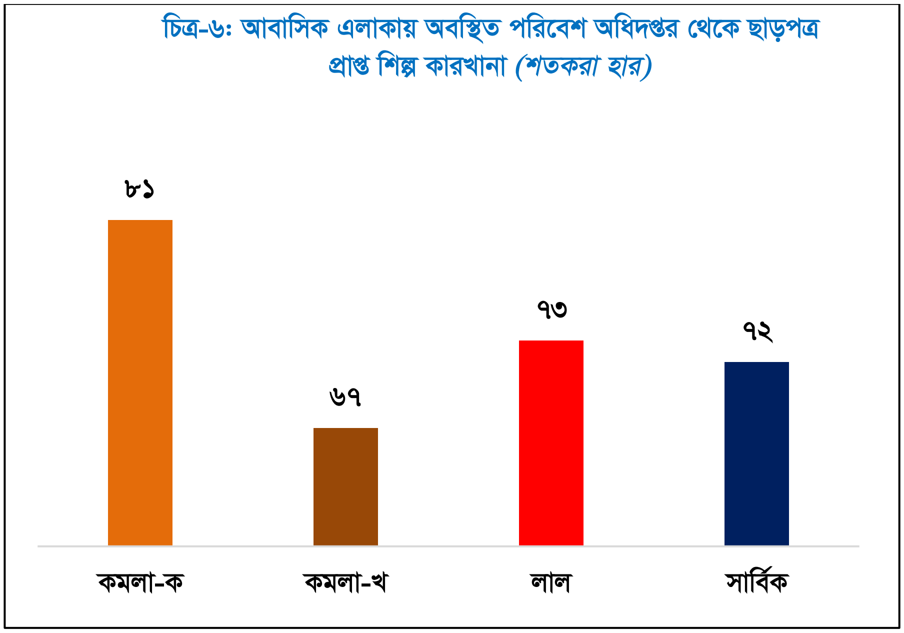

■ **দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান না করা:**দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সাজা প্রদানের কোনো উদাহরণ নেই। আইনে সর্বোচ্চ দশ বছরের সাজা নির্ধারিত থাকলেও অদ্যাবধি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরি সীলগালা করে দেওয়া বা দূষণকারীদের জেলে পাঠানোর মতো কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের নজির নেই।[১১৩]

বক্স-৪: "পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো পরিদর্শক বা কর্মকর্তা পরিবেশ আদালতে মামলা করলে তিনিই সেই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হন। কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিয়মিত কোর্টে না যাওয়া, তদন্ত প্রতিবেদন জমা না দেওয়া বা সঠিকভাবে তদন্ত করতে না পারার অভিযোগ থাকলেও অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগে ঘাটতি।"

(সূত্র: একজন পরিবেশ আইন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য)

৫.২. ক্ষমতার অপব্যবহার

■ **জরিমানা মওকুফ বাণিজ্য:**পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের ক্ষমতা অপব্যবহার করে পরিবেশ দূষনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জরিমানার অর্থ মওকূফ করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। জরিমানা মওকুফ এবং কমানো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সংগঠিত সিণ্ডিকেট চক্রের

---

[১১২] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৩.০২.২০১৯।
[১১৩] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ০৫.০২.২০২০।

মাধ্যমে। জরিমানা মওকুফের টাকার একটা নির্দিষ্ট অংশ আবার ভাগাভাগি হচ্ছে অধিদপ্তর থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত অংশীদারদের মধ্যে। এমনকি সম্প্রতিঅর্থ ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দের কারণে বদলিহতে হয়েছে এক কর্মকর্তাকে।[১১৪,১১৫]

- **পরিবেশ দূষণে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার:**ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ, আত্নীয়-স্বজন এবং অনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমেই মূলত বড় বড় শিল্প কারখানা যেগুলোর ইটিপি নেই বা কাজ করছে না এবং বিতর্কিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে। [১১৬]

বক্স-৫ঃআমাদের দেশে পরিবেশ বিপন্নকারী বিভিন্ন কাজকর্ম যেমন পরিবেশগত ছাড়পত্র না নিয়ে শিল্পকারখানা পরিচালনা করা, জলাশয় আইন লঙ্ঘন করে জলাভূমি দখল করা, বন অধিদপ্তরের জমি দখল করা, দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা ইত্যাদি যারা করে সবসময় দেখা যায় তারা মূলত ক্ষমতাসীন সরকারের একটা অংশ বা তাদের সমর্থনপুষ্ট বা তাদের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক আছে। দেখা যায় যে প্রথমত, ক্ষমতাসীন সরকারে যারা থাকে তারা এই ধরনের কর্মকাণ্ড বেশী করে। দ্বিতীয়ত, তাদের আত্নীয়-স্বজন,আশির্বাদপুষ্ট লোকজন, ব্যবসায়িক অংশীদাররা এই ধরনের কর্মকাণ্ড করে। আবার পূর্বের সরকারের আমলে যারা এই ধরনের কাজের সাথে জড়িত ছিলো, দেখা যায় নতুন সরকার আসার সাথে সাথে তারা নতুন সরকারের লোকজনের সাথে একধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলে। সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হয় তারা চাঁদা দেয় অথবা তাদের লভ্যাংশ দেয় অর্থাৎ কোনো না কোনো ভাবে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলে। যেহেতু সবচেয়ে ক্ষমতাশীল লোকেরা পরিবেশ দূষণের সাথে লিপ্ত এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্ষমতা তাদের ক্ষমতার চেয়ে বেশি না সেহেতু পরিবেশ অধিদপ্তরের যে ঘোষিত ক্ষমতা বা লিখিত ক্ষমতা তা পরিবেশ দূষণকারীদের অলিখিত ক্ষমতার চেয়ে বেশী না।

(সূত্রঃ একজন পরিবেশ আইন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য)

- **প্রভাবশালীদের হুমকি:**পরিবেশ অধিদপ্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে প্রভাশালীদের হুমকি, হস্তক্ষেপ এবং সরকারের উচ্চ মৌখিক পর্যায়ের নির্দেশনা। রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র যে জীব-বৈচিত্রের জন্য হুমকিস্বরুপ সেটা প্রকল্পের ইআইএ রিপোর্টে চলে আসলেও সেই প্রকল্পকে তারা ছড়পত্র দিতে বাধ্য হয়েছে কারণসরকারি প্রকল্পকে জরিমানা করলে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি আটকে দেওয়াসহ নানাভাবে হয়রানি করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[১১৭]

৫.৩. মনিটরিং এণ্ড এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে দুর্নীতি

- **ইটিপি থেকে নির্গত পানির মান যাচাইয়ে দুর্নীতি:** আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও স্ট্যাণ্ডার্ড টেস্টিং করা প্রতিষ্ঠান থেকে পানির মান যাচাই করার বাধ্যবাধকতা না থাকায় দুর্নীতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কতিপয় প্রতিষ্ঠান, যথা: পরিবেশ অধিদপ্তর, সায়েন্স ল্যাবরেটরি এবং ডিপিএইচই ইত্যাদির রিপোর্ট ছাড়া অন্য কোনো স্বীকৃত ল্যাবের রিপোর্ট গ্রহণ করে না। পানির যে প্যারামিটারগুলো আছে সেগুলোতদারকিরসময় যদি অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে টাকা দিলে ফলাফল ঠিক করে দেওয়াসহ নিয়ম বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের একাংশের কর্মীদের মাধ্যমে ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে।[১১৮]

[১১৪] এক আপিলেই ৮০ লাখ টাকা মাফ, সমকাল, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3mLdYXBসর্বশেষ ভিজিট: ০৯.১২.২১।

[115] জরিমানা মওকুফের সুযোগে দূষণ বাড়ছে, বণিক বার্তা, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/31gz1tFসর্বশেষ ভিজিট: ০৯.১২.২১।

[১১৬] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ০৫.০২.২০২০।

[১১৭] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদি, ০৫.০২.২০২০।

[১১৮] তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ২১.০১.২০২০।

বক্স-৬:''শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র নবায়নের পরে তিন মাস পর পর পানির নমুনা পরিবেশ অধিদপ্তরে জমা দিতে হয়। মোট পাঁচটা ক্যাটাগরীর প্যারামিটার পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন জমা দিতে হয় এবং আবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর অধিদপ্তর তাদের সুবিধামতো সময়ে নির্দিষ্ট পয়েন্টে যেয়ে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে। পরীক্ষা করার পর শুধুমাত্র ডিও ছাড়া অন্যকোন প্যারামিটারে সমস্যা খুঁজে পায় তবে সাথে সাথে মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্টকে রিপোর্ট করে। অন্যথায় শুধু যদি ডিওতে কোন সমস্যা ধরা পড়ে তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় যে তাদের ডিওতে সমস্যা আছে তাই এই একটা প্যারামিটার তাদের আবার পরীক্ষা করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান আবার একটা প্যারামিটারের জন্য ফি জমা দিয়ে পরীক্ষা করে। এক্ষেত্রেও যদি ফলাফল ভালো না হয় তবে মাত্র একটা প্যারামিটারের জন্য ছাড়পত্র আটকে আছে যাদের এবং বার বার টেস্ট করেও যারা ঠিক করতে পারছে না তখন অধিদপ্তর এর একাংশের কর্মীদের সাথে পারস্পারিক যোগসাজসে এবং নিয়ম বহির্ভূত অর্থের লেনদেনের মাধ্যমে ছাড়পত্র পেতে শুধু এই একটা প্যারামিটারের জন্য এক লাখ পর্যন্ত টাকা লেনদেন হয়ে থাকে। অর্থাৎ কন্ট্রাক্ট থাকে যে প্রতি কোয়র্টারে এক লাখ করে মোট ৪ লাখ দিবে এবং রিপোর্টগুলো সব ভালো আসবে। ফ্যাক্টোরিগুলো যখন এই পন্থা অবলম্বন করে তখন তারা ট্রিটমেন্ট ভালোভাবে করে না, দূষিত পানি সরাসরি পরিবেশে ছেড়ে দেয়।''   (সূত্র: একটি পরামর্শক সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মন্তব্য)

- **ইটিপির কার্যক্রম তদারকিতে দুর্নীতি:** পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক কারখানায় নিয়মিতভাবে ইটিপি সচল রাখা হয় কিনা সেটা তদারকি করার কথা থাকলেও পারস্পরিক যোগসাজসে এবং নিয়ম বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের একাংশের কর্মীদের মাধ্যমে ইটিপি অচল/বন্ধ থাকলেও জরিমানা করা হয় না।

- **অনিয়মিত তদারকি ও দূষণের উৎস বন্ধে তৎপরতার অভাব:** ইটভাটাসহ মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন, কালোধোঁয়া, পানি দূষণ, প্লাস্টিক দূষণ, বড় প্রকল্প থেকে দূষণ, ভবন নির্মানে দূষণের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করার বিধান থাকলেও কার্যকর তৎপরতায় ঘাটতি লক্ষনীয়। এছাড়াও কেইস প্রকল্পের মূল কাজ ছিলো বায়ু দূষণের জন্য দায়ী উৎসগুলোকে বন্ধ করা। কিন্তু উৎস বন্ধ করতে হলে যানবাহনের জ্বালানিকে পরিবেশ বান্ধব করতে হবে, মাটির বিকল্প ব্লকইটের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, পরিবেশসম্মত উপায়ে নির্মান কাজ সম্পন্নকরতে হবে যার একটিও এই প্রকল্পের আওতায় কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় নি বলে অভিযোগ রয়েছে।[১১৯]

৫.৪. ইআইএ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

- **ইআইএ রিপোর্টতৈরির আগেই প্রকল্পের কাজ শুরু করে দেওয়া:**কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে ইআইএ না করে বরং প্রকল্প বাস্তবায়ন এর প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে যাওয়ার পর ইআইএ সম্পন্ন করা হয় এবং একে এক্সটেনশান ইআইএর নামে সেটা চালিয়ে দেওয়াহয়। বিশেষ করে সরকারি প্রকল্পগুলোতেইইই এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র পরিবেশ অধিদপ্তর আগেই দিয়ে দেয় এবং এসব করার সাথে সাথেই নির্মাণকাজ শুরু হয়ে যায়। ফলে পরবর্তীতে ইআইএ রিপোর্টে পরিবেশ দূষণের ঝুঁকিচিহ্নিত হলেও প্রশমন ব্যবস্থা দিয়ে প্রকল্প চালু রাখতে হয়।[১২০]
- **ইআইএ রিপোর্টজমা দেওয়া ছাড়াই ছাড়পত্র প্রাপ্তি:** পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে অন্যতম একটি উপাদান পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন হলেও প্রক্রিয়াটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় এটি অনেকটাই কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। জরিপের তথ্যমতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লাল শ্রেণি শিল্প ইউনিটের ছাড়পত্র প্রাপ্তির আগে ইআইএ রিপোর্ট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও শতকরা ২২ ভাগই ইআইএ রিপোর্ট জমা দেয়নি (চিত্র-৭)।

[১১৯] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ১৫.০৩.২০২০।
[১২০] তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ২১.০১.২০২০।

চিত্র-৭: ছাড়পত্র প্রাপ্তির আগে লাল ক্যাটাগরীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইআইএ রিপোর্ট জমা দেওয়ার হার

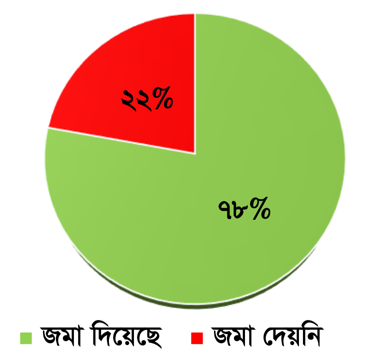

৫.৫. ছাড়পত্র প্রদানে দুর্নীতি ও অনিয়ম

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও এই কার্যক্রমে দুর্নীতির ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করেছে। জরিপে শতকরা ৫১ ভাগ শিল্প কারখানার কাছ থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের পরে সবুজ শ্রেণির জন্য ১৫ কার্যদিবস, কমলা-ক শ্রেণির জন্য ৩০কার্যদিবস এবং কমলা-খ ও লাল শ্রেণির ক্ষেত্রে ৬০ কার্যদিসের মধ্যে ছাড়পত্র প্রদান করার বিধান থাকলেও জরিপে অংশগ্রহণকারী শতকরা ৭৯ ভাগ শিল্প কারখানা দাবি করেছে তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাড়পত্রের জন্য পান নি অর্থাৎ ছাড়পত্র পেতে দেরি হয়েছে। এছাড়াও ছাড়পত্র আবেদন প্রক্রিয়া জটিল বলে মন্তব্য করেছেন ৫৭ ভাগ শিল্পকারখানা।পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য কোনো কোনো কর্মকর্তার সাথে দালালের পূর্ব যোগসাজশ করে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে ছাড়পত্র প্রদানের অভিযোগ ইতোমধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে উত্থাপিত হয়েছে। একইরকম ফলাফল দেখা গিয়েছে শতকরা ৫৬ ভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যাদের কাছে সেবার বিনিময়ে সরাসরি ঘুষ চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অসহযোগিতামূলক আচরণের শিকার হতে হয়েছে।

চিত্র-৮: পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়ম
(শিল্প কারখানার শতকরা হার; একাধিক উত্তর)

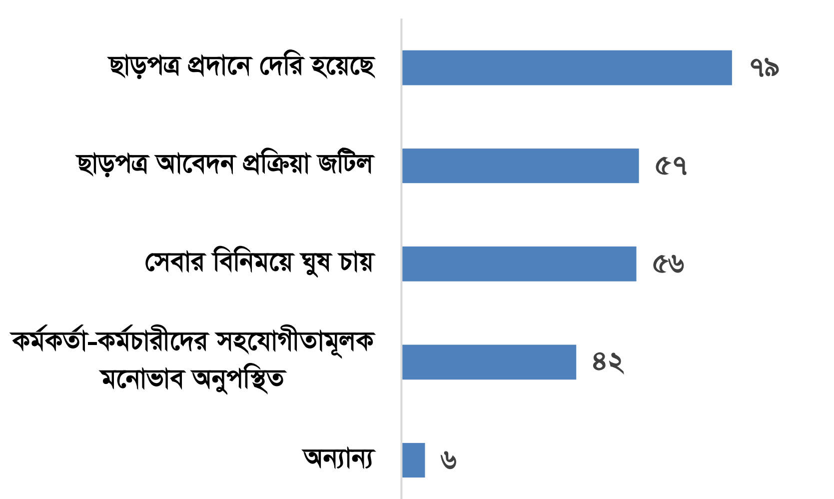

বাধ্যতামূলক হলেও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভূক্ত শিল্প কারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র আবেদনের সময় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও জরিপের আওতাভূক্ত শতকরা ৫৭ ভাগ শিল্পকারখানা/প্রকল্প কোনো প্রকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছে।

চিত্র-৯: পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ছাড়াই কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভূক্ত শিল্প কারখানা/প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান *(শতকরা)*

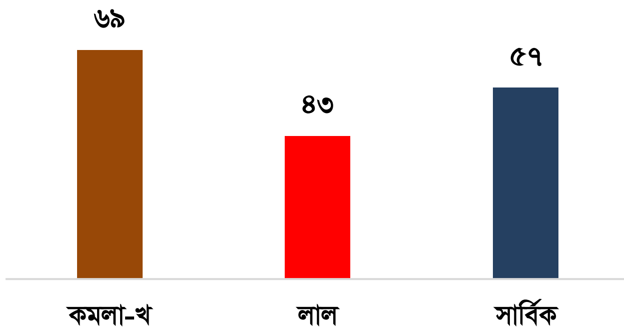

জরিপকৃত শিল্প কারখানার শতকরা অন্তত ৬৬ ভাগ পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে(যেমন অনাপত্তিপত্র পাওয়া, অবস্থানগত ছাড়পত্র পাওয়া) অতিরিক্ত ফি প্রদানসহ নিয়ম বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন করে থাকে।

চিত্র-১০: পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন (শিল্প কারখানার শতকরা হার)

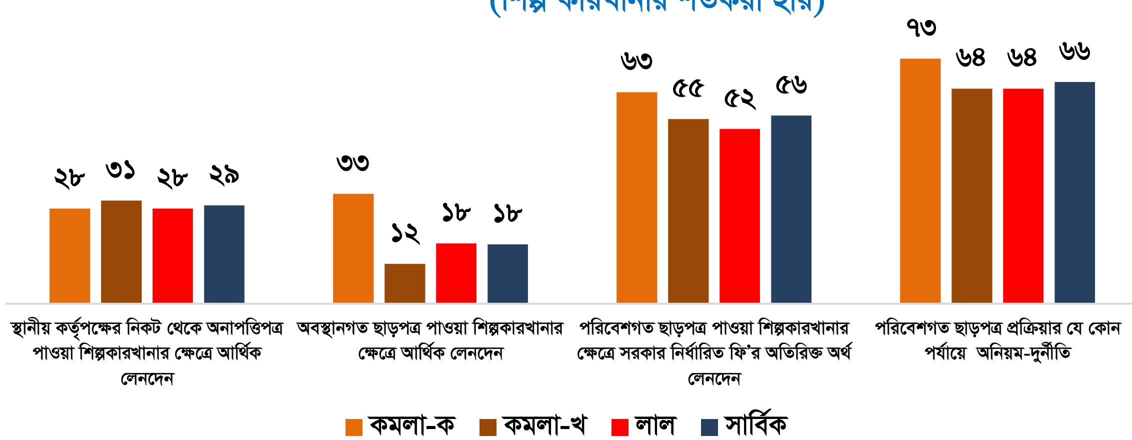

জরিপকৃত শিল্প কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রেনিভেদে সার্বিকভাবে সর্বনিম্ন ৩৬,০০০ টাকা থেকে ১,০৮,০০০ টাকাপর্যন্ত নিয়ম বর্হিভূত আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সারণি-৯: পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির পরিমাণ (টাকা)

শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরন	স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম বর্হিভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)	অবস্থানগত ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম বর্হিভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)	পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম বর্হিভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)	সার্বিক নিয়ম বর্হিভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)
কমলা-ক	৬,৪০০	৯২,০০০	১০,৫০০	৪৩,০০০
কমলা-খ	৯,৫০০	৮৬,০০০	৪৪,০০০	৩৬,০০০
লাল	৮,০০০	১,২৫,৮০০	১,৬৬,০০০	১,০৮,৮০০

৫.৬.অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতি

অধিদপ্তরের ‘নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ’ প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। এই প্রকল্পের অধীনে অযৌক্তিকভাবে একই কর্মকর্তার ১০ বারসহ ১০ বছরে মোট ২৯৩ জন কর্মকর্তার বিদেশে প্রশিক্ষণের নামে ভ্রমণ বাবদ অর্থ অপচয় করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে (আইএমইডি) প্রেরণ করেছেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের ক্ষমতা অপব্যবহার করে এবং অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জরিমানার অর্থ মওকুফ করে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। কারখানায় ইটিপির কার্যকরতা তদারকির সময় অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের পারস্পরিক যোগসাজশে এবং নিয়ম বর্হিভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে মাধ্যমে ইটিপি অচল/বন্ধ রাখা ও জরিমানা করা হয়না। পরিবেশ অধিদপ্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যতম অন্তরায় হিসেবে প্রভাবশালীদের হুমকি, হস্তক্ষেপ এবং সরকারের উচ্চ মৌখিক পর্যায়ের নির্দেশনা রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশমালা

৬.১. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় সার্বিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পরিবেশের সুরক্ষা ও দূষণ রোধে প্রদত্ত ক্ষমতা ও সক্ষমতার কার্যকর ও ন্যায়সংগত প্রয়োগে পরিবেশ অধিদপ্তর ব্যর্থ হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের প্রয়োজনীয় ধারা, বিধিমালা ও সম্পূরক আইন প্রয়োগে অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবংসময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিদ্যমান আইন সংস্কার ও সংশোধনের জন্য কার্যকর উদ্যোগ অনুপস্থিত। একদিকে পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের দুর্বলতা রয়েছে এবং অন্যদিকে বিদ্যমান আইন, বিধিমালাসহ সম্পূরক আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের ঘাটতি, দক্ষ জনবলের অভাব এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগ অনুপস্থিত।এছাড়াও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ ও প্রতিবেশ চিহ্নিত করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির (যেমন- জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম, রিমোট সেনসিং) সম্প্রসারণসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্বিক প্রশাসনিক ও জনবল কাঠামো পুরোপুরি পুনর্বিন্যাস বা ঢেলে সাজানোরকোন উদ্যোগ নেই। দেশে পরিবেশ দূষণের সামগ্রীক অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। কিন্তু চাহিদানুসারে জনবল এমনকি জেলাভিত্তিক পরিবেশ অধিদপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেওসুস্পষ্ট অবহেলা লক্ষ্য করা যায়।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ সরকারি বিভিন্ন বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্প কারখানা স্থাপনই মূলত পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী; এক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ অগ্রাধিকার কার্যক্রমের অংশ হওয়ার কথা থাকলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের বিদ্যমান ক্ষমতা প্রয়োগে

ব্যর্থতা লক্ষ্যণীয়। সরকারি বিভিন্ন বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং উৎসাহিত শিল্প কারখানা স্থাপন, প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা, বন ও এর আশেপাশে বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশ সমীক্ষা সম্পাদন এবং এসবের উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর বিদ্যমান আইনী ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থতার প্রমান দিয়েছে। ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ সরকারি প্রকল্পগুলোকে অনাপত্তি বা লিখিত নোটিশ দেওয়া পর্যন্তই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিলো। প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাধর ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো অবস্থান তাদের গ্রহণ করতে দেখা যায় নি।

কর্মীদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বড় অংকের নিয়ম বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতির ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। পরিবেশ ছাড়পত্র, নবায়ন ছাড়পত্র, জরিমানা নির্ধারন, জলবায়ু প্রকল্প ইত্যাদিতে দুর্নীতির মাধ্যমে বড় অংকের নিয়ম বর্হিভূত আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হচ্ছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে কিছু কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা হলেও পর্যাপ্ত প্রচার প্রচারণা ও দুর্বল জনসংযোগের কারণে আধুনিক সেবা থেকে সাধারণ জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে।

অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকে যেমন স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, জনসম্পৃক্ততা এবং কার্যকর সমন্বয়ে ঘাটতি বিদ্যমান। পরিবেশ রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ে ঘাটতি থাকায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা ব্যহত হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারি জলাধার, নদীতীর, বনভূমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং সব ধরনের দূষণ বন্ধসহ শিল্প কারখানার বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী ইটিপির কার্যকরতা নিশ্চিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। নিয়মিত তদারকি না হওয়ার সুযোগ নিয়ে অসৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো দূষণ কার্যক্রম চালু রাখছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিদপ্তর পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও অর্থের বিনিময়ে তাদের দূষণ কার্যক্রমকে বাধা দিচ্ছে না। ফলে, একদিকে সামর্থ্যের ঘাটতি এবং অন্যদিকে সরকারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণে ঘাটতির কারণে পরিবেশ রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর।

ইআইএ রিপোর্টগুলো অধিকাংশই 'কপি-পেস্ট' করে জমা দেওয়া হয় এবং বাস্তব চিত্র গোপন করার চিত্র গবেষণায় উঠে এসেছে। এমনকি ইএমপি প্রনয়ণ এবং তদানুযায়ী আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সেটা তদারকি নিশ্চিতে অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদানকে কেন্দ্র করে। ক্রমশই এই খাতে দুর্নীতির বিস্তার হচ্ছে এবং তা প্রতিরোধে অধিদপ্তরে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়াও সকল স্তরের কর্মকাণ্ডে কার্যকর তদারকি ও পরিবীক্ষণের ঘাটতিসহ নিয়মিত পারফরমেন্স অডিট হয় না।

সর্বোপরি, আমলা-নির্ভরতা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ঘাটতি, নীরিক্ষায় ঘাটতি, পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি এবং অনেক ক্ষেত্রে সৎ সাহস ও দৃঢ়তার ঘাটতির কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর একটি দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অনেকাংশে অক্ষম ও অকার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হয়েছে।

৬.২. সুপারিশমালা

গবেষণার আলোকেআধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরকে একটি সক্ষম ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদানের লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে-

৬.২.১. নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যা করণীয়

১. পরিবেশ সংরক্ষণে কথা এবং কাজের দ্বৈততা পরিহার করতে হবে এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হবে;

১. পরিবেশ বিষয়ক গবষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে;

২. অঞ্চলভিত্তিক পরিবেশগত ঝুঁকি নিরূপন সাপেক্ষে 'এনভায়রনমেন্টাল এ্যাকশান প্ল্যান' তৈরি করতে হবে এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিপূর্ণ আইনি কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে;

৬.২.২. পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার সংশোধন, প্রণয়ন ও প্রতিপালন

৩. আইন সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ আদালতে সাধারণ মানুষের সরাসরি মামলা করার সুযোগ রাখতে হবে;

৪. ইটিপির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রনয়ণ করতে হবে;

৫. সরকারি বা বেসরকারি প্রকল্পের ইআইএতে উল্লেখিত মিটিগেশান প্ল্যান ও ইএমপি ডিজাইন প্রস্তাবনা অনুসারে এর সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতে নিয়মিত পরিবেশগত নিরীক্ষার (এনভায়রনমেন্টাল অডিট) ব্যবস্থা করতে হবে;

৬. আইন ভঙ্গকারী এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের বিরুদ্ধে পরিবেশ আইনের স্বাধীন ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;

৭. তদারকির সময় যেসকল প্রতিষ্ঠানে অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে সে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণে সকল প্রকার ভয়, চাপ ও আর্থিক প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে অন্যায় কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে;

৮. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে স্ব-স্ব ইআইএ রিপোর্ট প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক করে আইন জারী করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তা উন্মুক্ত করতে হবে;

৯. সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকল্প ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বাজেটে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬.২.৩. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

১. পরিবেশ অধিদপ্তরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং নিবেদিত প্রাণ কর্মী সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ দিতে হবে;

২. স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়ন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;

৩. প্রেষণে পদায়ন না করে অধিদপ্তরের নেতৃত্বে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে হবে;

৪. পরিবেশ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য অধিক সংখ্যক আইনজীবী নিয়োগ দিতে হবে;

৬.২.৪. অবকাঠামো ও লজিস্টিক্যাল

১. প্রতিটি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

২. পরিবেশ আদালত আইনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় পরিবেশ আদালত স্থাপন করতে হবে;

৩. যথাযথ চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে সকল কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ, অবকাঠামো এবং কারিগরি ও লজিস্টিক্যাল সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;

৪. পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সকল ল্যাবরেটরীতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। প্যারামিটারের মান নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কার্যকরতা নিয়মিত যাচাই করতে হবে।

৬.২.৫. ডিজিটাইজেশন

১. ওয়েবসাইটকে আরো তথ্যবহুল (যেমন- নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে করা জরিমানা ও আদায়ের পরিমাণের ওপর পূর্ণাঙ্গ তথ্য) করতে হবে ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;

২. অধিদপ্তরের সকল প্রকার তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই সেটা সহজলভ্য করতে হবে;

৩. দুর্নীতি রোধে ডিজিটাল ও আধুনিক তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বৃহৎ প্রকল্পের দূষণসহ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা (পলুশন কন্ট্রোল মেকানিজম) চালু করতে হবে।

৬.২.৬. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

১. বৃহৎ প্রকল্পসহ সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকল্পের স্বাধীন, বিশ্বাসযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরিবেশত সমীক্ষা সাপেক্ষে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ার সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;

২. প্রকল্প বাস্তবায়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে জড়িত সকল কর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের সদস্যদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়াসহ তা প্রকাশ করতে হবে;

৩. পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহ আরো যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে এবং কার্যক্রম সম্পর্কে আরো বেশি করে প্রচার করতে হবে;

২. তদারকির সময় সঠিক পদ্ধতিতে ও স্বচ্ছতার সাথে দূষণের নমুনা সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে;
৩. সকল ভয়, চাপ ও প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে দূষণের জন্য দায়ী শিল্প কারখানাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

৬.২.৭. দুর্নীতি প্রতিরোধে পদক্ষেপ

১. পরিবেশ সংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইনের আওতায় বিধিবদ্ধ করে ত্রুটিমুক্ত আইইই, ইআইএ, ইআইএসএ সম্পন্ন নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশসমূহ তদারকির জন্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;
২. পরিবেশ ছাড়পত্র কেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে;
৩. ইটিপির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতে সমগোত্রীয় শিল্প কারখানাগুলো গুচ্ছাকারে একত্রে গড়ে তোলা এবং বর্জ্য শ্রেণী ভিত্তিক বিশেষায়িত ইটিপিতে শোধন নিশ্চিত করাসহ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইএমপি তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

৬.৩. তথ্যসূত্র

আইন, নীতি, বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১৫/১৬-২০১৯/২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ২৭৫-২৭৭, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/35rsgkI, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ নভেম্বর ২০২১।

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১৫/১৬-২০১৯/২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ২৭৫-২৭৭, বিস্তারিত দেখুন: https://plandiv.portal.gov.bd/site/files/bd4f359e-ce93-4d0c-bac5-b36219aa8371 ,সর্বশেষ ভিজিট: ২৩ ডিসেম্বর ২০২১।

জাতীয় বননীতি ২০১৬ (খসড়া), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বর্তমান নাম 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়'), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি (২০১৬-২০৩১), বন অধিদপ্তর (সেপ্টেম্বর ২০১৬), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা-৩০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2tg1z5d, সর্বশেষ ভিজিট: ২৩ ডিসেম্বর ২০২১।

Public Procurement Act 2006 এবং Public Pocurement Rules 2008, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://www.rhd.gov.bd/Documents/PPR/07%20-%20ThePublicProcurementAct2006(041207)45.pdf এবং http://www.btcl.com.bd/files/img/act/PPR_Public-Procurement-Rules-2008-English.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ২ জানুয়ারি ২০২১।

অনুচ্ছেদ ১৮ (ক), পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-957.html সর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-791.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

মোবাইল কোর্ট আইন (২০০৯), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1025.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

পরিবেশ আদালত আইন (২০১০), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1061.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন (২০১৩), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1140.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1203.htmlসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/5a9d6a31_d858_4001_b844_817a27d079f5/ECR%201997.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা (২০০৪), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/b0928f6a_53c4_4af2_a444_49804c923fbd/ODS%20Rules%2C2004%20-%20Combiend.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা (২০০৬), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/e43886bc_0694_49f6_80f3_71d2a0edece1/Noise%20Control%20Rules.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা (২০০৮), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://www.poribesh.com/wp-content/uploads/2015/08/Medical-Waste-Management-Processing-Rules-2008-Bangla.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১১), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://www.poribesh.com/wp-content/uploads/2015/08/Hazardous-Wastes-and-Ship-Breaking-Waste-Management-Rules-2011-Bangla.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা (২০১২), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://www.poribesh.com/wp-content/uploads/2015/08/Bangladesh-Biosafety-Rules-2012-Bangla.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৬), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:http://www.doe.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/notices/db120080_4378_41af_977a_e96ada5586d1/ECA%20Rules_25-09-16.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৮), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তাড়িত দেখুন: http://plancomm.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/68e32f08_13b8_4192_ab9b_abd5a0a62a33/2021-02-03-17-04-ec95e78e452a813808a483b3b22e14a1.pdf

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), প্রকাশিত ২০২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, , বিস্তারিত দেখুন: https://plancomm.portal.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/8a4a19a2_ad6c_4de3_a789_15533b6a9a10/2020-08-31-16-09-91ffa489d550d61d313e3142db4fe43c.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও অন্যান্য প্রকাশনা

ইউনাইটেড নেশনস এনভাইরনমেন্ট প্রোগ্রাম, *Healthy Environment, Healthy People(2012)*, বিস্তারিত দেখুন- https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/premature-deaths-environmental-degradation-threat-global-public সর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

এনভাইরনমেন্ট পারফরমেন্স ইনডেক্স, *Global metrics for the environment: Ranking country performance on sustainability issues (2020),* বিস্তারিত দেখুন- https://epi.yale.edu/downloads/epi2020report20210112.pdfসর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

আইকিউ এয়ার; *World Air Quality Report Region & City PM2.5 Ranking(2020),* বিস্তারিত দেখুন- https://www.iqair.com/world-most-polluted-countriesসর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

হেলথ ইফেক্ট ইন্সটিটিউট, *State of global air: a special report on global exposure to air pollution and its health impacts(2020),* বিস্তারিত দেখুন-https://fundacionio.com/wp-content/uploads/2020/10/soga-2020-report.pdfসর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

Enhancing Opportunities for Clean and Resilient Growth in Urban Bangladesh: Country Environmental Analysis 2018, World bank.বিস্তারিত দেখুন: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/585301536851966118/enhancing-opportunities-for-clean-and-resilient-growth-in-urban-bangladesh-country-environmental-analysis-2018

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৪-১৫), পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন:http://www.doe.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/annual_reports/23d9dc54_1593_4a9a_8d6c_4276694034ce/67_annual_report__2014_2015.pdf

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৫-১৬), পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন:http://www.doe.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/annual_reports/56337355_b348_4028_8ba0_f39de646cab2/Annual%20Report%202016%20Final.pdf

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-১৭), পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন:http://www.doe.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/annual_reports/4f8241aa_8a4d_459a_8c99_2c77b48e8f43/Annual%20Report%202016-2017.pdf

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৭-১৮), পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সর্বশেষ ভিজিটঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন:http://www.doe.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/annual_reports/ea3c059f_0c0d_435a_9195_ba3e4989ac12/Annual%20report%202017-2018%20.pdf

সংবাদপত্র

হবিগঞ্জের সুতাং নদী রক্ষায় হাইকোর্টের রুল, রাইসিং বিডি, সর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১, বিস্তারিত দেখুন:https://www.risingbd.com/bangladesh/news/425649

পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করতে হবে, গোলাম রব্বানী: পরিবেশ ও সমাজবিষয়ক গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব ইয়র্ক (যুক্তরাজ্য), প্রথম আলো, সর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

পরিবেশ রক্ষা করেই উন্নয়ন রামপাল, রূপপুর নিয়ে আলোচনায় বক্তারা, প্রথম আলো, সর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১।

রামপালসহ 'প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশী' প্রকল্প বাতিলের দাবি, সারাবাংলা, সর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১, বিস্তারিত দেখুন: https://sarabangla.net/post/sb-570881/

পরিবেশের মরণবেশ:আইনে সংকট প্রয়োগও তথৈবচ, বিডিনিউজ২৪.কম, বিস্তারিত দেখুনঃ https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/36323 সর্বশেষ ভিজিট: ০৯.১২.২১।

আবাদী জমি গিলছে ইটভাটা, জাগোনিউজ২৪.কম, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jagonews24.com/country/news/653636সর্বশেষ ভিজিট: ০৯.১২.২১।

জরিমানার অর্ধেক টাকাই ফেরত, কালের কণ্ঠ, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2014/07/15/107048 সর্বশেষ ভিজিট: ০৯.১২.২১।

পরিবেশদূষণের জরিমানা লোক দেখানো, প্রথম আলো, সর্বশেষ ভিজিট- ০৮.১২.২০২১।

পরিবেশ দূষণে জরিমানার টাকা ক্ষতিগ্রস্তদের দেওয়ার সুপারিশ, জাগো নিউজ, সর্বশেষ ভিজিট- ০৮.১২.২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jagonews24.com/national/news/708543

৭০০ একর সংরক্ষিত বনভূমি প্রশাসন একাডেমির জন্য বরাদ্দে উদ্বেগ, সারাবাংলা, সর্বশেষ ভিজিট- ০৯.১২.২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://sarabangla.net/post/sb-595923/

এক আপিলেই ৮০ লাখ টাকা মাফ, সমকাল, বিস্তারিত দেখুন: https://samakal.com/bibidh/article/140560832/%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A7%AE%E0%A7%A6-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%96-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%ABসর্বশেষ ভিজিট: ০৯.১২.২১

জরিমানা মওকুফের সুযোগে দূষণ বাড়ছে, বণিক বার্তা, বিস্তারিত দেখুন: https://bonikbarta.net/home/news_description/274947/%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%93%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0সর্বশেষ ভিজিট: ০৯.১২.২১

প্রতিবেদনে ব্যবহার করা কিছু ওয়েবসাইট ও লিঙ্ক

পরিবেশ অধিদপ্তর: http://www.doe.gov.bd

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়: https://moef.gov.bd/

The World Bank in Bangladesh: https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh

UNESCO to Bangladesh: Cancel Rampal coal plant, or Sundarbans could be added to List of World Heritage in Danger in 2017, Endcoal.org, সর্বশেষ ভিজিট- ০৯.১২.২০২১,বিস্তারিত দেখুন- https://endcoal.org/2016/10/unesco-to-bangladesh-cancel-rampal-coal-plant-or-sundarbans-could-be-added-to-list-of-world-heritage-in-danger-in-2017/

৬.৪. সংযুক্তি

সংযুক্তি-১

পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমূহ নিম্ন-বর্ণিত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। 'সবুজ' শ্রেণির শিল্প/প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প পরিবেশের খুবই সামান্য ক্ষতি করে; 'কমলা-ক' পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে; 'কমলা-খ' এর ক্ষেত্রে পরিবেশের ঝুঁকি বেশি, এবং 'লাল' শ্রেণির ক্ষেত্রে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি বা মারাত্মকক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

শ্রেণিভিত্তিক শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

শিল্প শ্রেণি	পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তিতে অত্যাবশ্যকীয় কার্যাবলী										
	আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন না করা	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আইইই)	বর্জ্য নির্গমন ব্যবস্থা	বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন (ইটিপি)	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)	স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র গ্রহণ	দূষণ হ্রাসসহ জরুরী পরিকল্পনা	পুনর্বাসন পরিকল্পনা	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ)	অবস্থানগত ছাড়পত্র
সবুজ	√	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X

কমলা-ক	√	X	X	√	X	X	√	X	√	X	√
কমলা-খ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√
লাল	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

সংযুক্তি-২

বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি, প্রটোকল ইত্যাদিতে অনুস্বাক্ষর/অনুসমর্থন/অভিগমনের তালিকা:-

No	Environment Related International Conventions Protocols and Treaties	Signed	Ratified/Accessed (AC)/Accepted(AT)/Adaptation (AD)	Being Ratified
1.	International Plant Protection Convention (Rome, 1951.)		01.09.78	
2.	International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil (London, 1954 (as amended on 11 April 1962 and 21 October 1969.)		28.12.81 (entry into force)	
3.	Plant Protection Agreement for the South East Asia and Pacific Region (As amended) Rome, 1956.)		04.12.74 (AC) (entry into force)	
4.	Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water (Moscow, 1963.)	13.03.85		
5.	Treaty on Principles governing the Activities of States in the Exploration and use of outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies (London, Moscow, Washington, 1967.)		14.01.86 (AC)	
6.	International Convention Relating to International on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (Brussels, 1969.)		04.02.82 (entry into force)	
7	Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar,1971) ("Ramsar Convention")		20.04.92 (ratified)	
8.	Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons, and		13.03.85	

	on Their Destruction (London, Moscow, Washington, 1972.)			
9.	Convention Concerning the Protection of the World Cultural and natural Heritage (Paris, 1972.)		03.08.83 (Accepted) 03.11.83 (ratified)	
10.	Nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on the Biological Diversity	06.9.2011		
11.	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington, 1973.) (" CITES Convention")	20.11.81	18.02.82	
12.	United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 182.)		10.12.82	
13.	Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 1985.)		02.08.90 (AC) 31.10.90 (entry into force)	
13a.	Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreal 1987.)		02.08.90 31.10.90 (AC) (entry into force)	
13b.	London Amendment to the Montreal Protocol on substances that Deplete the Ozone Layer (London, 1990)		18.03.94 (AC) 16.06.94 (entry into force)	
13c.	Copenhagen Amendment to the Montreal protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992		27.11.2000 (AT) 26.02.2001 (Entry into force)	
14	Montreal Amendment of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Montreal, 1997		27.07.2001 (Accepted) 26.10.2001 (Entry into force)	
15	Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (Vienna, 1986.) 07.01.88 (ratified)		07.02.88 (entry into force)	
16	Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident of Radiological Emergency (Vienna, 1986.)		07.01.88 (ratified) 07.02.88 (entry into force)	
17	Agreement on the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific (Bangkok, 1988.)		15.05.90 (ratified)	
18	Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Basel, 1989.)		01.04.93.(AC)	
19	International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation (London, 1990.)	30.11.90		In the process of ratification
20	United nations Framework Convention on Climate Change, (New York, 1992.)	09.06.92	15.04.94	
21	Convention on Biological Diversity, (Rio De Janeiro, 1992.)	05.06.92	03.05.94	
22	International Convention to Combat Desertification, (Paris 1994.)	14.10.94	26.01.1996 (Ratification) 26.12.1996 (entry into force)	

23	Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques, (Geneva, 1976.)		03.10.79 (AC) (entry into force)	
24	Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (New York, 1994.)	28.07.96		
25	Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (New York, 1995.)	04.12.95		
26	Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Paris, 1993.)	14.01.93	26.01.96	
27	United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and /or Desertification, Particularly in Africa (Paris, 1994.)	14.10.94		
28	Convention on Nuclear Safety (Vienna, 1994.)	21.09.95	21.09.95 (AT)	
29	Cartagena protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity	21.5.2000		In the process of ratification
30	Convention on persistent Organic Pollutants, Stockholm	23.5.2001		In the process of ratification
31	Kyoto protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change		21.08.2001 (AC) 11.12.1997 (AD)	
32	The International Convention for the Preventing of Pollution from the Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto {(MARPOL 73/78)		4.11.2002 (AC)	

Note: AC: Accession/Accessed; AD: Adaptation/Adapted; AT: Accepted

উৎস: জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৮), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন:https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/page/6ee9d54b_b349_4e85_b0da_6df1225285cb/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%20%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AE.pdf।

সংযুক্তি-৩

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য যা যা প্রয়োজন:--

ক্রমিক নং	প্রয়োজনীয় উপাদান
১	সম্ভাব্যতা রিপোর্ট (নতুন শিল্প কারখানার জন্য প্রযোজ্য)
২	ইআইএর জন্য অনাপত্তি পত্রসহ প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান চিহ্নিত করে), প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, প্রকল্প অথবা শিল্প ইউনিটের বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশা ও সময়সূচি (এগুলো শুধুমাত্র প্রস্তাবিত শিল্প ইউনিট বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
৩	প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রামের সাথে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), লে আউট পরিকল্পনা (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান চিহ্নিত করে), ইউনিট বা প্রকল্পের বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশা ও তথ্য (এগুলো শুধু বিদ্যমান শিল্প ইউনিট ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
৪	দূষণের প্রভাব হ্রাস পরিকল্পনা ও জরুরী পরিকল্পনা
৫	স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র
৬	পুনঃস্থাপন,পুনর্বাসন পরিকল্পনার রুপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৭	অবস্থানগত ছাড়পত্র
৮	ইটিপি অনুমোদনের জন্য আবেদন
৯	ইটিপি স্থাপন
১০	পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন

<u>সংযুক্তি-৪</u>

পরিবেশগত ছাড়পত্র/ছাড়পত্র নবায়ন ফি

ধরণ	বিনিয়োগকৃত অর্থ (টাকা)	পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি (টাকা)	ছাড়পত্র নবায়ন ফি (টাকা)
শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প	১-৫ লক্ষ	১,৫০০	মূল ছাড়পত্র ফি এর এক চতুর্থাংশ
	৫-১০ লক্ষ	৩,০০০	ঐ
	১০-৫০ লক্ষ	৫,০০০	ঐ
	৫০ লক্ষ-১ কোটি	১০,০০০	ঐ
	১-৫ কোটি	২০,০০০	ঐ
	৫-২০ কোটি	৪০,০০০	ঐ
	২০-৫০ কোটি	৮০,০০০	ঐ
	৫০-১০০ কোটি	১,২০,০০০	ঐ
	১০০-২০০ কোটি	২,০০,০০০	ঐ
	২০০-৫০০ কোটি	৩,০০,০০০	ঐ
	৫০০-১০০০ কোটি	৪,০০,০০০	ঐ
	১০০০ কোটির উপরে	৫,০০,০০০	ঐ
ইটভাটা	১-৫০ লক্ষ	১৫,০০০	মূল ছাড়পত্র ফি এর অর্ধেক
	৫০ লক্ষ-১ কোটি	২০,০০০	ঐ
	১-৫ কোটি	২৫,০০০	ঐ
	৫ কোটির উপরে	৪০,০০০	ঐ

পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/71a829c3_6b74_4ee9_90a6_158e2898b228/Ecfee.pdfসর্বশেষ ভিজিট: ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১।